৮.১৩ পিরামিডের অভ্যন্তরে (২) – Bangla Library

৮.১৩ পিরামিডের অভ্যন্তরে (২) – Bangla Library

পিরামিডের অভ্যন্তরে (২) –১৩৩

গাড়িখানা এসে থামলো মিসরীয় হীমশালীং পর্বতমালার অদুরে পাদদেশে।

এই পর্বতের নামানুসারেই হীমশালীং সরাইখানার নাম রাখা হয়েছে। হীমশালীং সরাইখানা থেকে এক সময় পৌঁছে গেলো গাড়িটি জঙ্গীশাহর আস্তানার সন্নিকটে। ড্রাইভার গাড়ি থামাতেই দু'জন বলিষ্ঠ লোক নেমে এলো পর্বতমালার ওপর থেকে। জঙ্গীশাহ ততক্ষণে গাড়ির পাশে নেমে দাঁড়িয়েছে। অপরজন মীরার হাত এবং পায়ের বাঁধন খুলে দিলো। মুখের রুমালখানা বের করে নিলো।

এবার মীরা সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলো। সে বেশ বুঝতে পেরেছে যে ঐ দিনের রক্ষাকারীর বেশে যে ব্যক্তি তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলো

সে আসল ব্যক্তি নয়, ছদ্মবেশে নরশয়তান দুষ্কৃতিকারী ছিলো ঐ ব্যক্তি। তার পিতার পাশ থেকে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চলে এসেছে। গাড়িতে তুলে নেওয়ার পর তার হাত-পা বাধা হয়েছিলো এবং কাঁধে তুলে নেবার পর পরই মুখে রুমাল গুঁজে দেওয়া হয়েছিলো। এতক্ষণে ভালভাবে নিঃশ্বাস নিলো মীরা, তাকালো সে করুণ ভয়ার্ত অসহায় দৃষ্টি মেলে। ড্রাইভার একবার তাকিয়ে দেখলো মীরার করুণ অবস্থা।

ওদের একজন মীরাকে কাঁধে তুলে নিয়ে হীমশালীং পর্বতের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

মীরা চিৎকার করে বললো—কে আছো বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও আমাকে বাঁচাও……

কিন্তু কে তাকে এই দুর্গমস্থানে বাঁচাতে আসবে! পর্বতের গায়ে প্রতিধ্বনিত হলো মীরার কণ্ঠস্বর। আকাশে-বাতাসে তার সেই করুণ আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু পাষাণ হৃদয় ওরা, এতটুকু মায়া জাগলো না তাদের মনে। মীরাকে কাঁধে নিয়ে উঠতে লাগলো পাহাড়ের ওপরে।

জঙ্গীশাহ চলেছে তাদের পেছনে পেছনে। তার মুখমণ্ডলে একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে।

পর্বতের গায়ে ছোট ছোট ঝোঁপঝাড়, সেসব পেরিয়ে ওরা মীরাকে নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। জঙ্গীশাহর সঙ্গীটি তার পাশে পাশে চলেছে। তার মুখেও শয়তানি হাসির আভাস।

কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে মীরার।

আর সে চিৎকার করতে পারছেনা, মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করছে। মীরার ভাবনা, তার মান-সম্মান ইজ্জত যেন রক্ষা পায়। কিন্তু তা কি রক্ষা পাবে সে…..

এক সময় মীরাকে নিয়ে ওরা জঙ্গীশাহর আস্তানা পর্বত হীমশালীংয়ের গুহায় প্রবেশ করলো। একটি অন্ধকার গুহায় ওকে বন্দী করে রেখে ফিরে এলো ওরা জঙ্গীশাহর দরবার কক্ষে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সামনে এবং পাশে বেশ কিছু অনুচর দণ্ডায়মান, সবাই তাকিয়ে আছে জঙ্গীশাহর ইংগিতের অপেক্ষায়।

জঙ্গীশাহ বললো– যে আমাকে কাবু করে মীরাকে উদ্ধার করে রাজপ্রাসাদে পৌঁছে। দিয়েছিলো, সে লোক কে, তাকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছিলাম কিন্তু তাকে তোমরা খুঁজে পাওনি।

একজন বলে উঠলো—হুজুর, যাদের ওপর নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে কারণ তারা সফলকাম হয়নি।

জঙ্গীশাহর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, বললো যাও এইদণ্ডে তাদের হাজির করো।

হুজুর, আপনার আদেশ শিরোধার্য।

বেরিয়ে গেলো দু'জন।

একটু পরে শৃঙ্গলাবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে এলো পাঁচজন অনুচরকে। তাদের প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া পরানো। জঙ্গীশাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হলো ওদেরকে।

জঙ্গীশাহ কোমরের বেল্ট থেকে পিস্তল খুলে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, কঠিন কণ্ঠে বললো—কি সংবাদ বাহাদুর সিং?

হুজুর, আমরা অনেক সন্ধান করেছি, কিন্তু……

কথা শেষ হয় না বাহাদুর সিংয়ের, জঙ্গীশাহর পিস্তল গর্জন করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বাহাদুর সিংয়ের রক্তাক্ত দেহ প্রজ্জলিত অগ্নিকুরে সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো, বার দুই ঝাঁকুনি দিয়ে নীরব হয়ে গেলো ওর দেহটা।

ওর সঙ্গীরা ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা বুঝতে পেরেছে তাদের অবস্থাও এমনি হবে।

জঙ্গীশাহ বলে উঠলো—ফরিদরমেং, তোমার সংবাদও ঐ……

সে কিছু বলতে গেলো কিন্তু তার পূর্বেই জঙ্গীশাহর গুলী তার বক্ষ ভেদ করলো।

একে একে পাঁচজন অনুচরের একই অবস্থা হলো। তাজা রক্তে ভেসে গেলো পাথুরিয়া মেঝেটা।

অগ্নিকুরে লাল আলোতে মৃতদেহগুলো বীভৎস দেখাচ্ছিলো। বিস্ময়কর মর্মান্তিক পরিবেশ। জঙ্গীশাহ হত্যালীলা সাঙ্গ করে পা বাড়ালো সেই গুহার দিকে যে গুহার বন্দিনী রয়েছে রাজ কুমারী মীরা।

জঙ্গীশাহর মুখমণ্ডলে ক্ষুব্ধ শার্দুলের মত ভয়ংকর ও লালসাপূর্ণ ভাব ফুটে উঠেছে। হিংস্র দানবের মত সে দৃপ্ত দম্ভে এগুতে লাগলো মীরার গুহার দিকে।

সেই অন্ধকার গুহায় বন্দী করে রাখার পর গুহার ঠাণ্ডা পাথুরিয়া মেঝেতে উবু হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো সে। বার বার তার মনের আকাশে ভেসে উঠছিলো সেই দুটো চোখ, কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই কণ্ঠস্বর কিন্তু কে সে যে সেদিন ফেরেস্তার মত এসে তাকে উদ্ধার করেছিলো। শুধু তার কথা স্মরণ হচ্ছে। সেদিন সে যেভাবে তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলো আজ কি পারে না তেমন করে বাঁচাতে।

অন্তর দিয়ে মীরা আল্লাহকে স্মরণ করছিলো। তিনি যেন তাকে উদ্ধার করেন। সেই মহৎ ব্যক্তিটিকেই কামনা করছিলো মীরা মনে মনে।

গুহায় প্রবেশ করলো জঙ্গীশাহ, দু'চোখে তার লালসা। মীরার দিকে রক্তাভ চক্ষু মেলে তাকিয়ে বললো—সুন্দরী রাজকন্যা মীরা, আজ কে তোমাকে রক্ষা করবে। এখন একমাত্র আমিই তোমার রক্ষাকর্তা জঙ্গীশাহ।

মীরা অস্ফুট কন্ঠে উচ্চারণ করলো–তুমিই ডাকু জঙ্গীশাহ! সেই নরপশু তুমি!

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো জঙ্গীশাহ, তাহলে তুমিও জানো আমি হিংস্র পশুর চেয়েও ভয়ংকর। তোমার ঐ সুন্দর দেহটাকে আমি চিবিয়ে খাবো। কেউ-বাধা দিতে আসবে না। আজ কোথায় তোমার উদ্ধারকারী সেই রত্ন বাহাদুর যে আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিলো?

তার কথা তুমি মুখে এনো না নরাধম। সে তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেও ভক্ষণ করেনি, কারণ সে মহৎ ব্যক্তি।

মহৎ———তাকে একবার পেলে আমি তার মহত্ত্ব ঘুচিয়ে দেবো। তাকে আমি হত্যা করবো।

তুমি শয়তান! শুনেছি তুমি শিয়ালের চেয়েও ধূর্ত——আর দানবের চেয়েও ভয়ংকর।

হাঁ, যা শুনেছে তা সত্য আর তার নিদর্শন এই মুহূর্তে দেখতে পাবে। কথাটা বলে জঙ্গীশাহ দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলে মীরাকে।

মীরা ভীত-আতঙ্কিত হয়ে উঠলো, সে পিছু হাঁটতে লাগলো। ফ্যাকাশে রক্তশূন্য হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল।

গুহার মধ্যে বাইরের আলো তেমনভাবে প্রবেশে সক্ষম নয় তবুও সামান্য আলোর রশ্মি প্রবেশ করছিলো, সেই আলোতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো মীরা শয়তান জঙ্গীশাহকে। সে কি ভয়ংকর চেহারা ওর! মীরার কণ্ঠনালী শুকিয়ে আসে।

জঙ্গীশাহ তার হাত দু'খানা বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মীরার দিকে, তার চোখেমুখে হিংস্র লালসা। দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

মীরা গুহার দেয়াল আঁকড়ে ধরলো।

ওদিকে আর এগুবার পথ নেই।

মীরার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে জঙ্গীশাহ, হাত দুখানা তার আরও কাছে। মীরা গুহার দেয়ালে মিশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জঙ্গীশাহ মীরাকে হেঁচকা টানে, টেনে নেয়, তারপর তাকে ক্ষুধার্ত বাঘের মত আক্রমণ করে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে গুহায় প্রবেশ করে মারাঠা ড্রাইভার। সিংহের ন্যায় গর্জন করে বলে ছেড়ে দাও জঙ্গীশাহ! রাজকুমারীকে ছেড়ে দাও——-একটি জমকালো রিভলভার উদ্যত করে ধরেছ মারাঠা ড্রাইভার জঙ্গীশাহর বুক লক্ষ্য করে।

ফিরে তাকালো জঙ্গীশাহ।

সঙ্গে সঙ্গে দাতে দাঁত পিষে বললোহারামজাদা তুই! আমার ড্রাইভার হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা—-

মারাঠা ড্রাইভার কঠিন কণ্ঠে বললো—শয়তান, তুমি মনে করেছে চিরদিন এমনি করে অন্যায় করে যাবে আর তার কোনো প্রায়শ্চিত্ত হবে না! নরাধম, ছেড়ে দাও রাজকুমারী মীরাকে, ছেড়ে দাও বলছি—-

না! কিছুতেই ছাড়বো না।

সত্য?

হা সত্য।

সঙ্গে সঙ্গে মীরাকে জঙ্গীশাহ দু' বাহু দিয়ে টেনে নিলো এবং তার ওড়না ছিনিয়ে নিতে গেলো।

মারাঠা ড্রাইভার এ দৃশ্য লক্ষ করে ক্রুদ্ধ সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো জঙ্গীশাহর ওপর। জঙ্গীশাহর কবল থেকে মীরা ছাড়া পেলো। একপাশে সরে দাঁড়ালো মীরা। বাঘের কবল থেকে মেষশাবক ছাড়া পেলে তার যেমন অবস্থা হয় ঠিক সেই অবস্থা হলো মীরার।

নিজের দেহের বসন সংযত করে নিলো মীরা।

মারাঠা ড্রাইভার জঙ্গীশাহের পেটে লাথি মেরে তাকে ধরাশায়ী করলো, তারপর দক্ষিণ পা তুলে দিলো জঙ্গীশাহের পেটের ওপর।

সুচতুর জঙ্গীশাহ হাত দু'খানা দিয়ে মারাঠা ড্রাইভারের পেট চেপে মুচড়ে ধরে তাকে ফেলে দিলো এবং ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়ালো।

ততক্ষণে মারাঠা ড্রাইভারও উঠে পড়েছে এবং দ্রুতহস্তে ঘুষি চালালো তার চোয়ালে। শুরু হলো লড়াই। বিস্ময় নিয়ে দেখছে রাজকুমারী মীরা।

হিংস্র বাঘ আর পশুরাজ সিংহ যেমন লড়াই করে তেমনি ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো।

মারাঠা ড্রাইভারের হাত থেকে ছিটকে পড়েছে রিভলভার। দু'জনই চেষ্টা করছে রিভলভারখানা হাতে তুলে নিতে। কিন্তু উভয়েই শক্তিশালী, কেউ কাউকে কাহিল করতে পারছে না।

হঠাৎ মারাঠা ড্রাইভার রিভলভার হাতে তুলে নেবার সুযোগ পেলো কিন্তু ঐ মুহূর্তে চোখের পলকে জঙ্গীশাহ মীরাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে গেলো। ছুটলো জঙ্গীশাহ পর্বতের গা বেয়ে উপরের দিকে।

মারাঠা ড্রাইভার রিভলভার হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো গুহার বাইরে। ততক্ষণে জঙ্গীশাহের অনুচরগণ ঘিরে ফেলেছে মারাঠা ড্রাইভারকে। ওদিকে জঙ্গীশাহ মীরাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে, কানে ভেসে আসছে মীরার আর্তনাদের শব্দ-বাচাও——বাচাও— বাঁচাও—-

জঙ্গীশাহর দলবল মারাঠা ড্রাইভারকে আক্রমণ করলো। তারা একসঙ্গে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মারাঠা ড্রাইভার প্রস্তুত ছিলো, সে দ্রুত রিভলভারখানা পকেটে রেখে প্রচণ্ড ঘুষিতে এক একজনকে ধরাশায়ী করতে লাগলো। ইচ্ছা করে মারাঠা ড্রাইভার ওদের গুলী করে মারতে পারতো, কিন্তু সে কারও প্রাণনাশ করতে চায় না। মারাঠা ড্রাইভারের শরীরে এত শক্তি তাদের জানা ছিলোনা। কারও নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো কারও বা ঠোঁট কেটে ফাঁক হয়ে গেলো, কারও কপাল ফেটে রক্ত গড়ালো।

এবার এদিক ওদিক পালাতে লাগলো তারা দিশেহারার মত। কেউ কেউ ফিরে তাকাচ্ছিলো পেছনে মারাঠা ড্রাইভার ধাওয়া করছে কিনা।

কিন্তু মারাঠা ড্রাইভার তখন জঙ্গীশাহকে লক্ষ করে ছুটছে। দক্ষিণ হাতে তার রিভলভার। পর্বতের গা বেয়ে দ্রুত এগুতে পারছে না জঙ্গীশাহ। তাছাড়া তার কাঁধে রয়েছে একটি জ্বলজ্যান্ত মানুষ। যতই শক্তিশালী হোক না কেন বেশি হাঁপিয়ে পড়েছিলো সে। ততক্ষণে বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে, সে মনে করলো কেউ তাকে দেখতে পায়নি।

পর্বত শিখরের মাঝামাঝি একটি সমতলভূমিতে এসে জঙ্গী শাহ মীরাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে হাঁপাতে লাগলো। মীরা সেই ফাঁকে ছুটে পালাতে গেলো, কিন্তু

পারলো না জঙ্গীশাহ তাকে ধরে ফেললো।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মীরা।

জঙ্গীশাহ তাকে হিংস্র পশুর মত আক্রমণ করলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে মারাঠা ড্রাইভার লাফ দিয়ে পড়লো জঙ্গীশাহর ওপর, এবং ওর কণ্ঠনালী বা হাতে চেপে ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে রিভলভার চেপে ধরলো তার বুকে।

জঙ্গীশাহ দিশেহারার মত যেমনি ওর বুকে মুষ্ট্যাঘাত করতে গেলো, অমনি মারাঠা ড্রাইভারের হাতের রিভলভার গর্জে উঠলো।

বিকট একটা আর্তনাদ করে জঙ্গীশাহ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো।

মারাঠা ড্রাইভার নিজের মুখের দাড়ি গোফ সহ মাথার পাগড়ি খুলে ফেললো।

মীরা বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো এ সেই চোখ, যে চোখ তার মনপ্রাণ জয় করে নিয়েছিলো। মীরা শুনতে পেয়েছে সেই কণ্ঠ, যে কণ্ঠ জঙ্গীশাহর কবল থেকে উদ্ধারকালে শুনেছিলো। মীরা অবাক হয়ে বললো–আপনি! আপনিই সেই মহান পুরুষ?

ড্রাইভার বললো–আমি মহান পুরুষ নই রাজকুমারী, আমি একজন সাধারণ মানুষ।

জানিনা কে আপনি তবে আমি আপনাকে কোথাও দেখেছি। স্মরণ করতে পারছি না–

কোনো প্রয়োজন নেই, শিগগির চলুন রাজকুমারী ঐ শয়তানটির দলবল এক্ষুণি এসে পড়বে।

কোথায় যাবো?

আপনার পিতা সম্রাট আবদুল্লাহর কাছে। তবে আপাতত এই পর্বতের কোনো স্থানে আমাদের আত্মগোপন করতে হবে। কারণ জঙ্গীশাহের অনুচরগণ

আমাদের অনুসন্ধান করবে। রাজকুমারী আমার নিজের জন্য আমি ভাবছি না, ভাবছি আপনাকে নিয়ে——

আপনি পাশে থাকলে আমি কাউকে ভয় পাবো না। আপনি মানুষ নন ফেরেস্তা। আমার জীবন আমার ইজ্জত, আমার মান সম্মান আপনি রক্ষা করেছেন। চলুন কোথায় যাবো?

আসুন আমার সঙ্গে। অন্ততঃ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত আমরা এই পর্বতের কোনো স্থানে আত্মগোপন করে থাকবো। এখান থেকে নগরী বহুদূরে।

মীরা ফিরে তাকালো জঙ্গীশাহর প্রাণহীন দেহটার দিকে। পর্বতের পাথুরে মাটি লাল হয়ে উঠেছে উবু হয়ে পড়ে আছে শয়তানটা। মুখখানার কিছু অংশ নজরে পড়লো, হা করে আছে মুখটা।

মীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়েছিলো।

মারাঠা ড্রাইভার বললোনরশয়তানদের অবস্থা ঐ রকমই হয়!

মীরার মনে পড়লো প্রথম যেদিন জঙ্গীশাহ তাকে তার বান্ধবীদের মধ্যে থেকে জোর করে তুলে এনেছিলো, যেদিন তাকে ক্ষুব্ধ শার্দুলের মত আক্রমণ করতে যাচ্ছিলো, যে মুহূর্তে তার গাড়ি খানাকে ফলো করে আরও একটি গাড়ি এগিয়ে আসছিলো—— সেই মুহূর্তগুলো তার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো।

মারাঠা ড্রাইভার মীরাকে বললো—পেছনে শয়তান হিংস্র দানবের দল, সম্মুখে রাতের জমাট অন্ধকার–কাজেই এখন আমরা নিরাপদ নই মোটেই।

মীরা এবং মারাঠা ড্রাইভার পর্বতমালার ফাটল ধরে এগুতে লাগলো।

হঠাৎ একটা বল্লম এসে পড়লো তাদের চলার পথের ওপরে। আর একটু হলে বল্লমটা বিদ্ধ হতে রাজকুমারী মীরার পাঁজরে।

মারাঠা ড্রাইভার মুহূর্তে মীরাকে সরিয়ে নিয়েছিলো তাই সে বেঁচে গেলো, নাহলে বর্শাবিদ্ধ হয়ে এক্ষুণি মীরার মৃত্যু ঘটতো। ভীষণ ভীত হয়ে পড়লো মীরা, একেই সে জঙ্গীশাহর কবলে পড়ে নাজেহাল, সে ভাবতেও পারেনি এবার রক্ষা পাবে।

তাছাড়া জঙ্গীশাহর কবলে পড়ে নাজেহাল, সে ভাবতেও পারেনি এবার রক্ষা পাবে। তাছাড়া জঙ্গীশাহর রক্তাক্ত মৃতদেহটা তাকে ভয়ংকরভাবে আতঙ্কিত করেছে। রাজকুমারী মীরা কোনোদিন স্বচক্ষে হত্যাকাণ্ড দেখেনি, তার মনপ্রাণ ছিলো কোমল, সচ্ছ। ভাগ্যের লিখনে এসব অবস্থা আজ তাকে সহ্য করতে হচ্ছে।

মারাঠা ড্রাইভার মীরাকে নিয়ে দ্রুত পাহাড়ের ফাটলের মাঝে একটি পাথরের আড়ালে বসে পড়লে, চাপা কণ্ঠে বললো, জঙ্গীশাহর দল দূর থেকে আমাদের লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করছে। ওরা পুনরায় বর্শা নিক্ষেপ করতে পারে, কাজেই এই পাথরখরে আড়ালে লুকিয়ে থাকতে হবে। ওরা এদিকে আসবে। ধরা পড়ে যাবে তারা। মারাঠা ড্রাইভার মুহূর্ত বিলম্ব না করে মীরাকে নিয়ে পাহাড়ের ফাটলের ভেতরে দ্রুত হাঁটতে লাগলো, মীরা বারবার হোঁচট খাচ্ছিলো। বেশ কিছু দূরে এসে একটা গুহায় এসে ঢুকলো ওরা।

পর পর আরও কয়েকখানা বর্শা ঐ স্থানে এসে পড়লো। যেখানে তারা দাঁড়িয়েছিলো। জঙ্গীশাহর রক্তাক্ত দেহটা পড়েছিলো সেখানে, হয়তো বা সর্দারের দেহটা ওরা নিয়েছে, সবাই মিলে ওরা শোক করছে। সর্দারের এমন অবস্থা হবে ভাবতে পারেনি তারা। ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, আর সেই কারণেই অনুচরগণ তাদের সন্ধান করছে। ওদের চোখে পড়ে গেছে তারা দু'জন। তাদের দুজনকে দেখেই ওরা বর্শা ছুঁড়েছে। ওরা এদিকে এসে পড়বে।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে।

বড় ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছে মীরা, পাথরে হেলান দিয়ে বসলো সে এবং কিছুক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লো।

মারাঠা ডাইভার প্রহর গুণছে, রাতের অন্ধকারে মীরাকে তার পিতার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তারপর জঙ্গীশাহর আড্ডাখানা সমূলে ধ্বংস করে দিতে হবে, নইলে মিশরবাসীদের জীবনে অভিশাপ দূর হবে না।

মীরাকে জাগানো উচিত হবে না, মেয়েটির ওপর দিয়ে ভীষণ ঝড় বয়ে গেছে। বড় মায়া হয় মারাঠা ড্রাইভারের, সেও তো মানুষ, তাই তারও হৃদয় বলে একটা জিনিস আছে, মীরার দিকে তাকালো মারাঠা ড্রাইভার। মীরাকে বড় অসহায়, করুণ লাগছে। রাজপ্রাসাদের দুগ্ধফেনিল শয্যায় শুয়ে যে ঘুমায় আজ কঠিন পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে সুখনিদ্রায় অচেতন সেই রাজকুমারী।

একটু হাসলো মারাঠা ড্রাইভার, এমনি কত মানুষনামী জীবন পাঁচতলায় গদির ওপর শয়ন করে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে। কঠিন শীত যাদের নরম তুলতুলে দেহ স্পর্শ করতে পারে না। খররৌদ্রতাপ যাদের চামড়ায় আঁচ দেয় না, যারা পরের সম্পদ কেড়ে নিয়ে ইমারত গড়ে তারা জানে না শীতের কাপন বা খররৌদ্রতাপের প্রখরতা কেমন। মীরাও বড় আদরিণী, বড় সুখী একটি মেয়ে ——-

হঠাৎ মারাঠা ড্রাইভারের চিন্তাধারায় বাধা পড়লো, সে দেখলো একটি আলোর বল তাদের সামনে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে বুঝতে পারলো জঙ্গীশাহর অনুচরগণ তাদের সন্ধান করছে। আলোর ঝিলিক মাঝে মাঝে তাদের চোখেমুখেও এসে পড়ছে। ওরা যদি এক্ষুণি এদিকে এসে পড়ে তাহলে অসুবিধা হবে, কারণ মীরা বড় ক্লান্ত অবসন্ন, ঘুমিয়ে আছে। সে।

তবুও মারাঠা ড্রাইভার হকচকিয়ে গেলো না। রিভলভার উদ্যত করে অপেক্ষা করতে লাগলো।

মারাঠা ড্রাইভার লক্ষ্য করছে আলোর বাল্বটা এবার সোজা এদিকে এগিয়ে আসছে। এবার দেখতে পাচ্ছে সে, দশ-বারোটি জোয়ান লোক প্রত্যেকের হাতে সূতীক্ষ্ণধার বা তারা পর্বতের গা বেয়ে এগুচ্ছে। মারাঠা ড্রাইভার তাদের বাল্বের আলোতে এসেছে। টর্চের আলো পড়ে বর্শার ফলাগুলো চিকচিক করছে। মারাঠা ড্রাইভার বুঝতে পারে জঙ্গীশাহের অনুচরগণ ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে সর্দারকে হারিয়ে। তারা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে তাদেরই মারাঠা ড্রাইভার বিদ্রোহী হয়ে সর্দারকে হত্যা করেছে এবং রাজকুমারী মীরাকে সে আত্মসাৎ করার চেষ্টা চালিয়েছে। তারা আরও জানে মারাঠা ড্রাইভার তাদের সর্দারের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এই পর্বতমালার কোথাও আত্মগোপন করে আছে। তা ছাড়াও তাদের আরও রাগ এই কারণে যে, জঙ্গীশাহর যে অনুচরগণ ঐ মারাঠা ড্রাইভারকে আক্রমণ করেছিলো তাদের কয়েকজনকে হত্যা করেছে সে।

এ সব কারণে জঙ্গীশাহর অনুচরগণ ভীষণ ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হয়ে উঠেছে। তারা এবার দলবদ্ধভাবে বেরিয়েছে মারাঠা ড্রাইভার ও রাজকুমারী মীরার সন্ধানে।

অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা।

মারাঠা ড্রাইবার এবার বেরিয়ে আসে, সে বুঝতে পারে মীরাকে এতগুলো নরশয়তানের কবল থেকে রক্ষা করা কঠিন হতে পারে, তাই সে নিজে বেরিয়ে এলো ওদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে।

শয়তানদল টর্চের আলো ঘুরিয়ে চারদিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। সবার হাতেই বর্শা, চোখেমুখে হিংস্র ভাব। মারাঠা ড্রাইভার একটা ফাটলের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে ওদের লক্ষ্য করছে। রিভলভার তাক করে রেখেছে তাদের দিকে, কাছে গুহার ভেতর মীরা ঘুমিয়ে আছে।

মারাঠা ড্রাইভার নিশ্চিন্ত, কারণ তাকে কাবু না করে ওরা মীরার গুহার নিকটে পারবে না।

নরপশুর দল একেবারে কাছে এসে পড়েছে। মারাঠা ড্রাইভার এবার প্রথম ব্যক্তি যে টর্চ নিয়ে এগুচ্ছিলো তার বুক লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্তনাদ করে পড়ে গেলো লোকটা। অমনি চারদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো।

পরপর আরো দুটো গুলী মারাঠা ড্রাইভারের রিভলভার থেকে বের হলো, এবং আরও দু’জন ধরাশায়ী হলো।

এবার ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়লো।

ততক্ষণে মারাঠা ড্রাইভার এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের ওপর, আবার শুরু হলো। তুমুল যুদ্ধ।

ওদিকে গুলীর শব্দে মীরার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো, সে চোখ মেলে কিছু দেখতে পেলো না। শুধু অন্ধকার, জমাট অন্ধকার। ডাকলো-ড্রাইভার, আপনি কোথায়? আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আপনি কোথায়?

কোনো সাড়াশব্দ পেলো না মীরা।

তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে এলো গুহার বাইরে।

শুনতে পেলো আর্তনাদ আর লড়াইয়ের শব্দ।

মীরা ভালভাবে তাকালো, আকাশে অসংখ্য তারার প্রদীপ জ্বলছে। তারা স্বল্প আলোতে বেশ দেখতে পেলো অদূরে সমতল একটি পাথরখণ্ডের ওপর তুমুল লড়াই চলছে।

মীরার বুক কেঁপে উঠলো। কিছু পূর্বে গুলীর শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর মীরার বুকটা ধ করে উঠেছিলো। নিজের ওপর তার ভীষণ রাগ হচ্ছিলো। কারণ এই বিপদ মুহূর্তে তার ঐ ভাবে ঘুমিয়ে পড়া মোটেই ঠিক হয়নি। বেচারা ড্রাইভার তাকে বাঁচাতে গিয়ে বারবার মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবেলা করছে। না জানি আবার কোন বিপদ এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দেখলো নিকটেই লড়াই চলছে, তা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। মীরা আকাশের দিকে হাত তুলে বললো —হে দয়াময়, তুমি রক্ষা করো আমার উদ্ধারকারী ও আমাকে। আমার ইজ্জত রক্ষা করো হে রহমানুর রহিম!

হয়তো মীরার করুণ আবেদন আল্লাহতায়ালা কবুল করলেন, যারা মারাঠা ড্রাইভারকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেছিলো তারা এক এক করে পর্বতশৃঙ্গ থেকে গড়িয়ে পড়লো মারাঠা ড্রাইভারের প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে।

মারাঠা ড্রাইভার নিজেও বেশ আহত হয়েছিলো, কারণ একটা বর্শা তার বাঁ হাতে বিদ্ধ হয়েছিলো। রক্তাক্ত শরীরে ফিরে এলো মারাঠা ড্রাইভার।

মীরা অন্ধকারে তার দেহের রক্ত দেখতে পেলো না তবুও বেশ অনুভব করলো মারাঠা ড্রাইভার আহত হয়েছে।

সমস্ত রাত তার খুব অস্বস্তিতে কাটলো। আজ তারই জন্য বেচারা ড্রাইভারের এ অবস্থায় নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে তার।

এক সময় মোরগের ডাক শোনা গেলো। তারা বুঝতে পালো রাত ভোর হয়ে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পূর্বাকাশে সূর্য উঁকি দিলো।

ভোরের আলোতে মিশরীয় পর্বতমালা হীমশালীং উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

মীরা মারাঠা ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো–সর্বনাশ, আপনার একি অবস্থা হয়েছে! না না, এ হতে পারে না। আপনাকে মরতে দিতে

পারি না ড্রাইভার। আপনাকে মরতে দিতে পারি না—- দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো মীরা।

মীরা জানে, ও না থাকলে তাকে নরপশুর দল শকুনির মত ছিঁড়ে খেতো। ওর জীবন রক্ষা করা তার কর্তব্য। মীরা তাড়া তাড়ি নিজের ওড়না ছিঁড়ে মারাঠা ড্রাইভারের ক্ষত স্থানে বেঁধে দিলো।কিছু পানি দরকার, আর কিছু ওষুধের। কিন্তু পর্বতমালার ওপরে কোথায় পাবে সে পানি আর ওষুধ!

মীরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

মারাঠা ড্রাইভার ব্যথাকাতর কণ্ঠে বললো—আপনি কিছু ভাববেন না রাজকুমারী। আমার ক্ষত সেরে যাবে।

না, তা হয় না। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি দেখি কোথাও পানি পাই কিনা। শুনেছি হীমশালীং পর্বতে অনেক জলপ্রপাত আছে, যদি কিছু পানি পাই —

না না, যাবেন না রাজকুমারী, আবার কোন বিপদ আসবে কে জানে! ভাববেন না, আমি অল্পক্ষণেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

আমি জানি আপনার ক্ষত অত্যন্ত গভীর, কাজেই সহসা সেরে যাবে না। এখন আপনি হাঁটতে পারবেন না, তাতে আপনার শরীর থেকে আরও বেশি রক্তক্ষয় হবে। তাহলে, আপনাকে বাঁচাতে পারবো না।

আপনি বসুন, আমি বড় ক্লান্ত। দুচোখ ভরে ঘুম আসছে। মীরা, আমাকে রেখে আপনি যাবেন না।

বেশ, আপনি ঘুমান, আমি বসছি। তবে হঠাৎ যদি শত্রুপক্ষ কেউ এসে পড়ে?

আসবে না। সবগুলোই খতম হয়েছ। জঙ্গীশাহর দল নিধন হয়েছে। আর ওরা আসবে না।

মীরার মন কিছুটা আস্বস্ত হলো বটে কিন্তু তার ভীষণ চিন্তা মারাঠা ড্রাইভারকে নিয়ে। যদি ওর কিছু হয় তাহলে এই পর্বতমালার নির্জন গুহায় তাকে তিল-তিল করে মরণ করতে হবে। কোথায় তার পিতা সম্রাট আবদুল্লাহ–কোথায় পিতার

পারিষদ-গণ, কোথায় তার প্রিয় বান্ধবীরা। জানি না তারা সবাই কি করছে। তার ভাবনা হলো, বৃদ্ধ পিতা দুশ্চিন্তায় মৃত্যুবরণ না করেন!

মীরা মারাঠা ড্রাইভারের অদূরে বসে ভাবছে।

মারাঠা ড্রাইভার দু'চোখ মুছে শুয়ে পড়ে একটি ছোট পাথরখণ্ডে মাথা রেখে। তার মুখমণ্ডলে ব্যথারুণ ভাব ফুটে উঠেছে। অনেক রক্তক্ষয় হয়েছে তার দেহ থেকে।

রাজকুমারী তাকালে মারাঠা ড্রাইভারের চেহারার দিকে, কোথায় যেন এক মুখ সে দেখেছে, এ মুখখানা তার যেন বড় পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথায় দেখেছে, যে মহৎ ব্যক্তি তাকে প্রথমবার জঙ্গীশাহর কবল থেকে রক্ষা করেছিলো এ কি সেই ব্যক্তি তার মুখ তখন ঢাকা ছিলো কালো রুমালে, তাই তাকে দেখতে পায়নি মীরা, চিনতেও পারেনি কে সে। তবে তার ধারণা হচ্ছে এই ব্যক্তিই সেদিনের সেই মহাপ্রাণ ব্যক্তি। কারণ এর কণ্ঠস্বর এবং তার চোখ দুটো তার নিতান্ত পরিচিত মনে হচ্ছে।

মীরা আরও বুঝতে পারে মারাঠা ড্রাইভারের বেশ আসলে ওর ছদ্মবেশ। আবার ভালভাবে তাকায় মীরা, আহা বেচারা তারই জন্য ওর এ অবস্থা! দিনের আলোতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মীরা ওকে। বড়মায়া হচ্ছে মীরার, ওকে সুস্থ করে তোলা তার একান্ত কর্তব্য।

হঠাৎ মারাঠা ড্রাইভার অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করে—পানি—- শুধু একবার তার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে আসে, তারপর আবার নিশ্চুপ হয়ে যায়। মীরার কানে কথাটা যায়, সে অত্যন্ত ব্যথা কাতর হয়ে পড়ে এ মুহূর্তে পানির একান্ত দরকার কিন্তু কোথায় পানি পাবে সে। তবুও মীরা ধীর মন্থর পদক্ষেপে বেরিয়ে পড়লো, চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সন্ধান করতে লাগলো যদি কোনো পাহাড়িয়া ঝরনা বা জলপ্রপাত নজরে পড়ে।

কিছুটা এগুতেই চমকে উঠলো মীরা। আতঙ্কে শিউরে উঠলো সে, বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে কয়েকটি মৃতদেহ। দিনের আলোতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মীরা, কারও বুকে গুলীবিদ্ধ, কারও পাঁজরে বর্শা, কারও মাথা পাথরে ঠুকে ক্ষত-বিক্ষত, চোয়াল থেতলে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। .. কেউ বা উবু হয়ে, কেউ বা চিৎ হয়ে, কউ পাথরের হেলান দিয়ে মরে আছে। সেকি বীভৎস দৃশ্য, মীরা ভীত

হয়ে উঠলো। এতগুলো মৃতদেহ সে কখনও দেখেনি। সাত আটজন মৃত্যুবরণ করেছে। এরা জঙ্গীশাহর অনুচর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরা মৃত্যুবরণ করেছে ঐ মারাঠা ড্রাইভারের হাতে।

মীরার ধারণা সত্য, এর জঙ্গীশাহর অনুচর এবং তারা সকলে মিলে আক্রমণ করেছিলো মারাঠা ড্রাইভারকে। প্রথমবার পরাজিত হয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে এসেছিলো তারা মারাঠা ড্রাইভারকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু ওরা জানতো না মৃত্যু তাদের জন্যই প্রতীক্ষা করছে। মারাঠা ড্রাইভার সূতীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে এতগুলো শয়তান লোককে খতম করতে সক্ষম হয়েছিলো। শক্তি ও বলে ওরাও কম ছিলো না, তবে মারাঠা ড্রাইভারের বুদ্ধি কৌশলের কাছে ওরা নগণ্য।

মীরা যে কয়টি মৃতদেহ দেখলো তা ছাড়াও কয়েকজন পর্বত-শিখর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের সন্ধান জানে না মীরা। মনে মনে মীরা মারাঠা ড্রাইভারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানায়।

তারপর মীরা অগ্রসর হলো সামনের দিকে।

বেশ কিছুটা এগিয়ে আসতেই মীরা দেখলো সামনে একটি পাথরের আড়াল থেকে ধোয়া বেরিয়ে আসছে। আশ্চর্য হলো সে এই জনপ্রাণহীন পর্বতমালার ওপরে ধোয়া এলো কোথা হতে। তবে কি কোনো শত্রু ওখানে লুকিয়ে আছে। এমন সময় একটা শব্দ শুনতে পেলো সে-মানুষের গলার স্বর। এ কণ্ঠ কোনো নরপশুর নয়, বেশ বুঝতে পারে মীরা। সে অতি সাবধানে পর্বতমালার উঁচু পর্বত শৃঙ্গ থেকে বেয়ে কিছুটা নিচে নেমে এগুতে থাকে। যেদিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখছিলো সেই দিকে এগোয়, কিছুদুর যাওয়ার পর আনন্দে উফুল্ল হয়ে উঠলো মীরা। একটি গুহার সামনে জায়নামাজে বসে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দোয়া পাঠ করছেন এক দরবেশ। তার পাশে একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। ঐ অগ্নিকুণ্ড থেকে ধোয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। মীরা সেই ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিলো।

মীরা তার বাবাকে প্রতি ওয়াক্তে জায়নামাজে বসে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করতে দেখেছে, আজ এই বৃদ্ধ দরবেশকে দেখে তার পিতার কথাই মনে পড়লো। ধীর পদক্ষেপে মীরা এসে দাঁড়ালো দরবেশ বাবাজীর পাশে।

দরবেশ বাবাজী মোনাজাত শেষ করে ফিরে তাকালেন। দু'চোখে তার বিস্ময়, বললেন–কে মা তুই? এই পর্বতমালার ওপর এলি কি করে?

মীরা নতজানু হয়ে বসলো দরবেশের পাশে, বললো সব কথা। এমন কি মারাঠা ড্রাইভার তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, ঐ কথাও বললো সে। কিছু পানির সন্ধানে সে বেরিয়েছে, তাও বললো।

দরবেশ বাবাজী সব শুনলেন এবং ব্যথাভরা কণ্ঠে বললেন– সবকিছুই আল্লাহতায়ালার ইংগিতে হয়ে থাকে। তোর এ অবস্থার জন্য দুঃখ করিস না মা, হয়তো আল্লাহতায়ালা তোর কোনো মঙ্গলের জন্যই এটা করেছেন। চল কোথায় সেই মারাঠা ড্রাইভার, আমি তাকে ওষুধ দেবো। তুই আমার সন্তানের মত হোর প্রতি আমার কর্তব্য আছে।

দরবেশ বাবাজীর মায়াভরা কথায় মীরার দু'চোখে পানি এলো। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো সে–চলুন দরবেশ বাবাজী, চলুন। সত্যি আমার ভাগ্য প্রসন্ন তাই আল্লাহতায়ালা আপনার সাক্ষাৎলাভ ঘটালেন।

চল মা চল পানির সন্ধানে বেরিয়েছিলি না?'

হাঁ, বাবাজী পানি, ও পানি চাইছিলো।

আমার গুহায় বাটি আছে, নিয়ে আয়।

মীরা দরবেশ বাবাজীর গুহায় প্রবেশ করে দেখলে মাত্র একটি মাদুর জাতীয় বিছানা পাতা আছে গুহার মেঝেতে, একটি ছোট্ট পাথরখণ্ড বালিশরূপে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত আছে, আর আছে একটি পাতিল ও চামচ, পাশে একটি পানির পাত্র। মীরা পানির পাত্রটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

দরবেশ বাবাজী বললেন-সোজা পূর্বদিকে চলে যা, সেখানে একটি জলাধার দেখবি। পর্বতশৃঙ্গ থেকে নেমে এসেছে। ঐ জলাধার বা জলস্রোত থেকে পানির পাত্রটি ভরে পানি নিয়ে আয়। আমি অপেক্ষা করছি।

মীরার দু'চোখে আনন্দ অশ্রু নামলো। বারবার সে আল্লাহতায়ালার দরবারে শুকরিয়া করলো। এগিয়ে গেলো মীরা দরবেশ বাবাজীর কথামত। যা তিনি বলেছিলেন তাই হলো, দেখলো পর্বতমালার মাঝখান দিয়ে একটি জলস্রোত বয়ে

যাচ্ছে। কালো পাথরের বুক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ পানি। মীরা পাত্রভরে পানি তুলে নিলো, তারপর ফিরে এলো দরবেশ বাবাজীর কাছে। মীরার দু'চোখে আত্মতৃপ্তির আভাস। সে ভাবতে পারেনি এই সুউচ্চ পর্বতমালার বুকে এমন স্বচ্ছ শীতল জলধারার সন্ধান পাবে। দরবেশ বাবাজীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো মীরা।

বৃদ্ধ দরবেশ, যদিও বয়সের ভারে শরীরের বাঁধন তার কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছিলো তবুও পর্বতমালার উপরে উঠতে তার তেমন কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

মীরা ও দরবেশ বাবাজী এসে পৌঁছলো সেই গুহায়, যে গুহায় মারাঠা ড্রাইভার আহত অবস্থায় শায়িত ছিলো। মীরা ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললো ড্রাইভার, দেখুন কে এসেছেন। দেখুন ড্রাইভার——

মারাঠা ড্রাইভার চোখ মেলে তাকালো।

দরবেশ বাবাজী আরও কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন–বৎস, কোনো ভয় নেই আমি এই মায়ের মুখে সব শুনেছি। আল্লাহর রহমতে এবার তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে এবং রাজকুমারীকে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে।

মারাঠা ড্রাইভার উঠে বসতে গেলো। দরবেশ বাবাজী বললেন–শুয়ে থাকো বৎস, আমি তোমাকে ওষুধ দিচ্ছি, খাও। আমি তোমার ক্ষতস্থানেও ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি——

মীরা আঁচলে চোখ মুছে বললো—দরবেশ বাবাজী, আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বড় দয়াময়, তাই আপনার সাক্ষাৎ লাভ পেয়েছি——

মা,তুমি ব্যস্ত হবে না। ও সেরে উঠবে ইনশাল্লাহ। দরবেশ বাবাজী তার আলখেল্লার মধ্য হতে কয়েকটি বড়ি বের করে মারাঠা ড্রাইভারকে খাইয়ে দিলেন, তারপর তিনি নিজ হাতে তার ক্ষত স্থানে কিছু ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। বললেন দরবেশ বাবাজী এ সবই গাছ গাছড়ার তৈরি। আল্লাহতায়ালার কত মেহেরবানি, গাছ গাছড়ার মধ্যেও তিনি অমৃতসুধা দান করেছেন। বৃক্ষের রসে তৈরি এই ওষুধ, নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবে মারাঠা ড্রাইভার। তোমার আর কোনো চিন্তা নেই মা।

মারাঠা ড্রাইভারের চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে ওঠে। সে বলে-দরবেশ বাবাজী, আপনার দয়ার কথা চিরদিন স্মরণ থাকবে।

দরবেশ বাবাজী চলে যান।

মীরা তাকে কিছুটা পথ এগিয়ে দেয়।

তারপর ফিরে আসে মারাঠা ড্রাইভারের পাশে। মৃতদেহগুলো মীরার মনে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এমনভাবে মানুষের প্রাণহীন দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে সে দেখেনি কোনোদিন। মারাঠা ড্রাইভারের পাশে এসে দাঁড়ালো সে, ধীরে ধীরে ওর কপালের ওপর হাত রাখলো।

মারাঠা ড্রাইভার চোখ মেলে তাকালো।

মীরা বললো—আপনি সেরে উঠবেন? দরবেশ বাবাজী বলেছেন এসব ওষুধ গাছগাছড়ার তৈরি, আল্লাহর রহমতে আপনি সেরে উঠবেন——

মারাঠা ড্রাইভার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মীরার মুখের দিকে। তারপর বললো — রাজকুমারী, আপনি আমার মত একজন নগণ্য মানুষের জন্য এত ভাবছেন! কেন ভাবছেন? আমার মৃত্যু ঘটলেও আপনার কোনো অসুবিধা হবে না, আল্লাহ পাক দরবেশ বাবাজীকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আমি যদি না থাকি তবে তিনিই পৌঁছে দেবেন আপনাকে সম্রাটের কাছে।

না না, আমি তাই চাই না। আপনাকে ছেড়ে আমি ফিরে যাবো না। আপনিই সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম বার আমাকে জঙ্গীশাহর কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন ——

মীরা!

হাঁ, আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটি সেদিন কালো রুমালে ঢাকা ছিল না, আপনার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, আপনিই সেই—- আমি আপনাকে চিনতে ভুল করিনি। আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে আপনাকে আমি উপলব্ধি করেছি। জানিনা আপনি কে, কি আপনার পরিচয়, তবে জানি আপনি একজন মহান পুরুষ! আবেগে মীরার কন্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে।

মারাঠা ড্রাইভার বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। মেয়েরা মায়াময়ী, স্নেহময়ীই হয় কিন্তু এত দরদিনী রাজকন্যা মীরা!

দুদিনের মধ্যেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো মারাঠা ড্রাইভার। দরবেশ বাবাজী তাকে দেখতে আসতেন, তিনিই মীরা আর মারাঠা ড্রাইভারের খাবার আয়োজন করে দিতেন। পানিটা শুধু বহন করে আনতে মীরা।

মীরার সেবাযত্ন মারাঠা ড্রাইভারকে মুগ্ধ অভিভূত করে। সুস্থ হবার পর ড্রাইভার মীরাসহ হাজির হলো দরবেশ বাবাজীর গুহায়।

দরবেশ বাবাজী ওদের দুজনকে দেখে খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি প্রাণভরে দোয়া করলেন এবং মীরাকে রাজপ্রাসাদে ফিরে যাবার জন্য আদেশ দিলেন।

আনন্দ ধরে না মীরার।

মারাঠা ড্রাইভারের চোখেমুখেও আনন্দ উচ্ছ্বাস।

মীরা বললো—এবার আমার পিতার সঙ্গে দেখা না করে দূর থেকে পালিয়ে যেতে দেবো না আপনাকে।

একটু হাসলো মারাঠা ড্রাইভার।

বিদায় মুহূর্তে মারাঠা ড্রাইভার ও মীরা শেষবারের মত এলো দরবেশ বাবাজীর কাছে। পায়ে হাত রেখে কদমবুসি করলো ওরা। দরবেশ বাবাজী ওদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

বনহুর ডমীলুর শবাধারের ঢাকনা খুলে মাংসিয়াংতুর অভিনব উপায়ে তৈরি ওষুধ বের করে নিলো। ডমীলুর মুখে ওষুধ ঢেলে দিলো। চোখ মেলে তাকাতেই বনহুরকে দেখে হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত মুখে ডমীলু বলে ওঠে–তুমি!

হাঁ ডমীলু আমি। আর কতকাল তুমি এমনি করে ঘুমিয়ে থাকবে।

জানি না। একটু থেমে বললোডমীমাংসিয়াতুংর কবল থেকে আমি রক্ষা পেতে চাই। আগন্তুক, আমাকে তুমি ঐ নর পশুর কাছ থেকে উদ্ধার করে বাইরের জগতে নিয়ে চল।

যাবে? ডমীলু তুমি যাবে?

হাঁ, আমার জীবনটা বড় অসহনীয়। আমাকে বাঁচাও—— আমাকে বাঁচাও আগন্তুক।

বনহুর ডমীলুর কাঁধে হাত রাখলো, ওর করুণ অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে বড় মায়া হলো বনহুরের। সত্যি এ বেঁচে থাকার কোনো মূল্য হয় না। কতকাল ধরে ডমীলু বাক্সবন্দী হয়ে পিরামিডের অভ্যন্তরে কাল কাটাচ্ছে। এখনও সে জীবিত আছে, বাঁচার আশা-আকাঙ্ক্ষা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে বাঁচতে চায়, বেরিয়ে আসতে চায় মুক্ত আকাশের তলে।

কিন্তু ওকে কোথায় নিয়ে যাবে বনহুর! সম্রাট আহম্মদুল্লা হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়েছেন। তার সে প্রাসাদ আজ ধূলোয় মিশে গেছে, সেখানে গড়ে উঠেছে নতুন প্রাসাদ। সেদিনের সম্রাট পরিবারের কেউ আজ জীবিত নেই যে ডমীলুকে চিনতে পারবে বা আশ্রয় দেবে। এ সব কথা ডমীলুকে বুঝিয়ে বলার মত ভাষাও নেই বনহুরের। সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কিইবা করতে পারে সে।

ডমীলুর মধ্যে আজকাল ক্ষুধা-পিপাসার জন্ম নিয়েছে। কিছু খেতে চায় সে অবশ্য কারণ আছে। এতকাল তাকে মাংসিয়াংতু এমন ওষুধ খাইয়ে দিতো যা তাকে জীবন্ত করে রাখলেও সজীব ছিলো। বনহুর শুধু তাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার ওষুধটাই পেয়ে ছিলো এবং তাই সে খাইয়ে ওকে সজ্ঞান করতো। কিন্তু ঐ ওষুধ পায়নি বনহুর যা খাওয়ালে ডমীলুর ক্ষুধা-পিপাসা নষ্ট হবে। ঐ ওষুধ মাংসিয়াংতু নিজে তৈরি করেছিলো। সে ওষুধ কোথায় রাখে তা জানে না বনহুর! হয়তো ঐ ওষুধ মাংসিয়াংতুও খেতো, কারণ এখন তার যা আকৃতি প্রকৃতি হয়েছে তাতে সব সময় তো আর লোকালয়ে গিয়ে খাবার জোগাড় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

বনহুর শহর থেকে খাবার নিয়ে আসে নিজের জন্য কারণ যে খাবার তার জন্য পিরামিডের অভ্যন্তরে মিশরীয় সরকার রেখেছিলো তা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু নষ্টও হয়ে খাবারের অনুপযোগী হয়ে গেছে।

শহর থেকে যে খাবার নিয়ে আসে বনহুর তা সুন্দর এবং সুস্বাদু। মিশরীয় সরকার এবং কান্দাই সরকারের মিলিত প্রচেষ্টায় বনহুকে মিশরের কারাগারে আটক করার পরিকল্পনা করা হয়েছিলো তাতেও নিশ্চিন্ত হয়নি, আবার যদি পালিয়ে যায় সে। হাঙ্গেরী কারাগার যাকে বন্দী করে রাখতে পারেনি তাকে

মিশরের কারাগার আটকাতে সক্ষম হবে এ ভরসা পায়নি তারা, আর সে কারণেই কান্দাই সরকারের সঙ্গে যোগ দিয়ে মিসর সরকার এক অভিনব উপায় খুঁজে বের করে মিশরের পিরামিড আর্মানহুডের অভ্যন্তরে বনহুরকে বন্দী করে তার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলো। অবশ্য এ ব্যাপারে বেশি সহায়তা পেয়েছে কান্দাইয়ের অসৎ ব্যবসায়ী চরিত্রহীন নরশয়তান বাহাদুর সিং গডসের কাছে।

বনহুরকে আর্মানহুডের অভ্যন্তরে বন্দী করার পর মিশরীয় সরকার এবং কান্দাই সরকার ও বাহাদুর সিং গডসের ধারণা হয়েছে, বনহুর কোনোক্রমে জীবিত থাকতে পারে না, নিশ্চয়ই এতদিনে তার মৃত্যু ঘটেছে। অবশ্য এ ধারণা করাটা স্বাভাবিক, কারণ বনহুরকে পিরামিডের অভ্যন্তরে রেখে অতি সতর্কতার সঙ্গে পিরামিডের মুখগহ্বর পাথর আর সিমেন্ট দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো।

কিন্তু বিস্ময়করভাবে বেঁচে গেছে বনহুর তা কেউ জানে না। আর জানবেই বা কি করে তারা তো বনহুরকে জীবিত কবর দিয়েছে। এ সংবাদ প্রচারও হয়েছে বিশ্বের সবগুলো শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকায়।

পত্রিকায় ঐ সংবাদ পাঠ করে বিচলিত হলো নূর।

কালো রুমালে মুখের অর্ধাংশ ঢাকা বনহুরের একটি ছবিসহ এ সংবাদ প্রচার করা হয়েছে।

চায়ের টেবিলে বসে নূর ও আরমান কথা বলছিলো সেই মুহূর্তে এ সংবাদ প্রচারিত হলো বেতারে, তারপর প্রকাশ পেলো পত্র-পত্রিকায়। অবশ্য নূর যে কিছুটা জানতো না তা নয়, তবে এতখানি ঘটে গেছে তা জানতো না সে। সংবাদটা ভীষণ ভাবিয়ে তুললো নূর ও আরমানকে। কিছুদিন হলো মরিয়ম বেগমের মৃত্যু ঘটেছে, সে শোক ভুলতে না ভুলতেই তার পিতা গ্রেপ্তার হলো, তারপর এই সংবাদ। নূরকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে পিরামিডের অভ্যন্তরে বনহুরের আটক সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায়। তার মা এই সংবাদটা পড়ে কান্নাকাটি করে দিশেহারা হয়ে পড়বেন।

*

নূর আর আরমান যখন সংবাদপত্র নিয়ে দেখছিলো এবং আলাপ-আলোচনা করছিলো তখন বনহুর পিরামিডের অভ্যন্তরে ডমীলুর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলো।

বনহুর ডমীলুর সম্মুখে কিছু খাবার রেখে বললো—এ খাবার তুমি খেতে পারো।

ডমীলু বনহুরের দেওয়া খাবারগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকালো।

বনহুর বললো—নাও।

ডমীলু এবার বনহুরের হাত থেকে খাবারগুলো নিয়ে মুখে দিলো। হয়তো বা সুস্বাদু খাবারগুলো তার খুব ভাল লাগলো, তাই সে সবগুলোই প্রায় খেয়ে ফেললো।

ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো বনহুর। একালের নয়–সে কালের মানুষ ডমীলু-নতুন স্বাদের খাবারগুলো তার জিহ্বায় খুব সুস্বাদু লেগেছে। খাওয়া শেষ করে বললো ডমীলু-ভারী সুন্দর সুস্বাদু তোমার দেওয়া খাবারগুলো।

বনহুর বললো—সত্যি বলছো?

ডমীলু বললো– হাঁ, সত্যি বলছি। আমি কোনোদিন এমন খাবার খাইনি। তুমি বড় ভালো, তাই আমাকে এই সুস্বাদু খাবার এনে দিয়েছো। বলো আরও দেবে?

হাঁ ডমীলু দেবো।

তুমি আমাকে এই মৃত্যুকূপের বাইরে নিয়ে যাবে?

যাবো।

সত্যি বলছো আগন্তুক।

সত্যি বলছি——-

ঐ নরপশু আমাকে বিয়ে করতে চায়। আমি ওকে খুব ঘৃণা করি। জানো সে আমার বাবাকে ঠকিয়েছে। আমার জীবন বিপন্ন করেছে। আমি মুক্তি চাই। বলো আমাকে তুমি বাইরের জগতে নিয়ে যাবে?

যাবো কিন্তু মাংসিয়াংতু——

ঐ নাম তুমি মুখে এনো না। আমি ওর মুখ আর দেখতে চাই না।

বেশ, আমি তোমাকে বাইরে নিয়ে যাবো, কিন্তু তুমি কোথায় যাবে? তোমার পিতামাতা বা পরিচিত কাউকেই এখন দেখতে পাবে না ডমীলু।

সত্যি ওরা কেউ নেই।

না

তবে কোথায় যাবো! ডমীলুর মুখে বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠলো।

বনহুর নির্বাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলো বিস্ময়কর নারী ডমীলুকে।

ঐ মুহূর্তে একটা শব্দ হয়।

চমকে ফিরে তাকায় বনহুর আর ডমীলু।

তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে যমদূতের মত সেই অমানুষ মাংসিয়াংতু। তার মুখ আর চোখ রাগে ফুলে উঠেছে, চোখের তারাগুলো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

বনহুর ফিরে চাইতেই মাংসিয়াংতু তার লোমশ দক্ষিণ হাতখানা দিয়ে খপ করে বনহুরের ঘাড়টা চেপে ধরলো। বড় বড় নখগুলো যেন বনহুরের কাঁধে গেঁথে যাবার উপক্রম হলো।

ডমীলু ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলো, উঃ! মাংসিয়াংতু তুমি কত বড় নরপশু। ছেড়ে দাও ওকে——

ডমীলুর কথায় ভ্রূক্ষেপও করলো না মাংসিয়াংতু। সে ভীষণ দাঁতগুলো বের করে কামড়ে দিতে গেলে ওকে। বনহুর যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করলো।

– ডমীল অনুরোধের স্বরে বললো—ওকে হত্যা করো না মাংসিয়াংত। ও বড় দুর্বল তোমার কাছে!

বনহুর নিজকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। উঠে দাঁড়াতেই পুনরায় মাংসিয়াংতু বনহুরের জামার আস্তিন ধরে টেনে তুললো। দুহাতে সে তুলে নিলো ওকে মাথার ওপর।

ডমীলু ভীত আতঙ্কিতভাবে বললো—ওকে হত্যা করো না মাংসিয়াংতু, ওকে হত্যা করো না——

ততক্ষণে মাংসিয়াংতু বনহুরকে শূন্যে তুলে আছাড় মারলো পিরামিডের মেঝেতে। তারপর একখানা পা তুলে দিলো বনহুরের বুকের ওপর।

ডমীলু ছুটে এসে মাংসিয়াংতুর পা ধরে মিনতির সুরে বললো— ওর কোনো দোষ নেই। ও একজন মানুষ, তোমার-আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। ওকে ছেড়ে দাও। আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে বিয়ে করবো।

এবার যেন মাংসিয়াংতুর মুখখানা একটু প্রসন্ন মনে হলো। তাকালো সে ডমীলুর মুখের দিকে।

অসহায় ডমীলু মনকে শক্ত করে নিয়ে বললো–সত্যি কথা দিচ্ছি তোমাকে। যা তুমি চেয়েছে তাতে আমি রাজি। বিয়ে করবো তোমাকে—-

মাংসিয়াংতু বনহুরের বুক থেকে তার ভারী পা'খানা নামিয়ে নিলো, তারপর বনহুরকে তুলে বসিয়ে দিলো পাশের পাথরটার ওপরে। বনহুর তেমন কাহিল না হলেও বেশ খানিকটা দুর্বল বোধ করলো। কারণ শয়তান মাংসিয়াংতুর দৈহিক শক্তি অসুরের মত–সে মানুষ নয়, একটি জানোয়ারে পরিণত হয়েছে এখন।

ডমীলু বললো—ওকে জীবিত অবস্থায় আমাদের সঙ্গী করে নাও মাংসিয়াংতু। কারণ সে তোমার-আমার বিয়েতে একজন সাক্ষী হবে। তাছাড়া আমরা আর কাকেই বা এ সময় পাবো।

মাংসিয়াংতুর কাছে ডমীলুর কথাগুলো মন্দ লাগলো না বোধ হয়, তাই সে আবার তার অগ্নিগোলকের মত চোখ দুটো তুলে তাকালোডমীলুর ফিকে লাল মুখখানার দিকে।

বনহুর বেশ বুঝতে পারলো মাংসিয়াংতু হাজার বছর বেঁচে আছে তার অলৌকিক ওষুধ সেবন করে এবং শুধু বেঁচে নেই ভীষণ শক্তি লাভ করেছে সে।

ওকে কাবু করা সহজ ব্যাপার নয়। বহু শক্তিশালী জীবজন্তু এবং মানুষের সঙ্গে লড়াই করেছে বনহুর কিন্তু এমনভাবে কোথাও কারও কাছে পরাজয় বরণ করেনি সে। ডমীলু একটু পূর্বে তাকে বলছিলো, আমাকে এই মৃত্যুগহ্বর থেকে বাঁচাও—-আমি মাংসিয়াংতুকে সহ্য করতে পারছি না। বাঁচাও আগন্তুক। আমাকে বাঁচাও—

ডমীলু যখন দেখতে পেলো আগন্তুকটিকে মাংসিয়াংতু হত্যা করতে যাচ্ছে তখন সে তাকে বাঁচানোর জন্য মাংসিয়াংতুকে বিয়ে করবে বলে কথা দিলো। বনহুর তার চোখ দুটো তুলে ধরলোডমীলুর মুখের দিকে। লক্ষণ পরিস্ফুটিত। এবার মাংসিয়াংতুকে বিয়ে না করে উপায় থাকবে না। কিন্তু কি ভয়ংকর সে, ভাবতেই ডমীলুর শরীর শিউরে ওঠে। মাংসিয়াংতুকে সে কোনো সময় সুনজরে দেখেনি। মিশর রাজকুমারী কিনা বিয়ে করবে একটা সাধারণ বৈদ্যরাজকে। তবুও আজ মেনে নিতে হলো নির্মম এক অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে।

কিন্তু সত্যি কি ডমীলু মাংসিয়াংতুকে স্বামী বলে মেনে নেবে? পারবে তাকে গ্রহণ করতে? কি কুৎসিত আর ভীষণ ওর চেহারা! সমস্ত শরীরে লোম ঠিক সজারুর কাঁটার মত। দাঁতগুলো ময়লা ঢেকে কালো হয়ে গেছে, চুলে জটা ধরেছে, শরীরের উৎকট গন্ধে পেটের নাড়ীভুড়ি বেরিয়ে আসার উপক্রম।

ডমীলু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবে কি?

বনহুর মা সিয়াংতুর চেহারাটা আর একবার দেখে নিলো পা থেকে পর্যন্ত। তখনও ওর চেহারা থেকে ক্রুদ্ধভাবে দূরীভূত হয়নি। দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

হঠাৎ মাংসিয়াংতু ডমীলুর হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো।

বনহুরের মুখমণ্ডলে বিস্ময় ফুটে উঠলো, কারণ মাংসিয়াংতু এমনভাবে ডমীলুকে। টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবে তা সে ভাবতে পারেনি। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাচ্ছে মাংসিয়াংতু। যে পথে ও পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেই পথেই বেরিয়ে যায়। বনহুর তার পেছনে পেছনে তাকে অনুসরণ করলো। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেলো না। ক্রমান্বয়ে এগুচ্ছে সে, গাঢ় অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ ধর, ঐ পথে বনহুরও বাইরে যাওয়া-আসা করে, এ কারণে পথটা তার কাছে বেশ পরিচিত। যদিও অন্ধকার গুহাপথ তবুও কিছু কিছু নজরে পড়ছে, তবে স্পস্ট

নয়। বনহুর চারদিকে লক্ষ্য রেখে এগুচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা তীব্র আর্তনাদের শব্দ ভেসে এলো তার কানে।

বনহুরের কানে এ কণ্ঠস্বর পরিচিত মনে হলো। এটা যে ডমীলুর কণ্ঠস্বর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বনহুর ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়ালো, কান পেতে শুনলো, তবে কি ডমীলুকে মাংসিয়াংতু হত্যা করলো। একটা সন্দেহ তার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করলো। ডমীলুর করুণ মুখখানা ভেসে উঠলো চোখের সামনে।

বনহুরের ধারণা সত্য কিনা সে জানে না তবে মাংসিয়াংতু মানুষ নয়–সে এখন জন্তুর মত, কাজেই তার অসাধ্য কিছু নেই।

যতদুর সম্ভব দ্রুত পা চালিয়ে এগুলো বনহুর।

কিন্তু একি, গুহার মুখ একটি পাথর দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাংসিয়াংতু তাকে এই পিরামিডের ভেতরে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ রাখতে চায়। তবে কি মাংসিয়াংতু আর এ গুহায় প্রবেশ করবে না? বনহুর চেষ্টা করতে লাগলো পাথরখানা সরানো যায় কিনা। বিরাট পাথর, মাংসিয়াংতু ভীষণ শক্তিশালী আর ভয়ংকর, কাজেই তার পক্ষে পাথরখানা গুহার মুখে টেনে দেওয়া যতখানি সহজ হয়েছিলো ততখানি সহজ আর কারও জন্য নয়।

বহুক্ষণ চেষ্টার পর বনহুর পাথরখানাকে সরিয়ে ফেললো, তবে সম্পূর্ণ সরানো সম্ভবপর হলোনা কিছুটা ফাঁক করে সেই পথে বেরিয়ে এলো। পিরামিডের অভ্যন্তরে বদ্ধ সুড়ঙ্গপথে একটা দুর্বিষহ বাতাসবিহীন অবস্থা থেকে বনহুর বেরিয়ে আসতেই সচ্ছ হাওয়া তার নাকেমুখে প্রবেশ করলো। একটা সুন্দর আস্বাদ তাকে যেন সাদর সম্ভাষণ জানালো। অল্পক্ষণেই নিজকে বেশ স্বাভাবিক মনে করলো সে। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার বা বিশ্রাম নেবার সময় নেই। বনহুর সুড়ঙ্গের বাইরে দাঁড়িয়ে তাকালো এদিক ওদিকে। যদিও বহুক্ষণ কেটে গেছে তার সুড়ঙ্গমুখ থেকে পাথরখণ্ড সরিয়ে ফেলতে। তবুও তার কানের কাছে প্রতিধ্বনি হচ্ছে সেই করুণ ভয়ার্ত আর্তনাদ। বনহুর এখন চারদিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বনের। গভীরতা এখানে অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে। সূর্যের আলোকরশ্মি ডালাপালা আর লতাপাতার ফাঁকে ছড়িয়ে পড়েছে বনের মধ্যে।

বনহুর সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে এবং এগুচ্ছে সামনের দিকে। মাংসিয়াংতু অথবা ডমীলুর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।

আরও কিছুটা এগুতেই হঠাৎ বনহুর আতঙ্কে শিউরে উঠলো। ডমীলুর ছিন্নভিন্ন প্রাণহীন দেহটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বনহুর থ' হয়ে গেলো। তারপর এগিয়ে গেলো ডমীলুর মৃতদেহের পাশে। নৃশংস হত্যা, বুক চিরে দু' ফাঁক করা হয়েছে, বুকের মধ্য হতে কলিজাটা বের করে নেওয়া হয়েছে। রক্তের ছাপ ছাপ পাশে ছড়িয়ে আছে। শুকনো পাতাগুলোর ওপরে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেধে শুকিয়ে আছে।

বনহুর ডমীলুর করুণ অসহায় মুখখানা ফিরিয়ে নিলো নিজের দিকে। অধমেলিত দুটি চোখের কোণে দু'ফোঁটা অশ্রু জমে আছে তখনও। ঝরে পড়া একটি ফুলের মত লাগছে ওকে। ভালভাবে লক্ষ্য করে বনহুর বুঝতে পারলো মাংসিয়াংতু ডমীলুর বুক চিরে তার হৃৎপিণ্ডটা বের করে নিয়েছে। তবে কি সে সম্পূর্ণ হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। তাই হবে, না হলে যে ডমীলুকে জীবন্ত করে হাজার হাজার বছর ধরে তাকে পাবার বাসনা বুকে নিয়ে প্রতীক্ষা করেছে, সেই মাংসিয়াংতু তাকে কি করে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করলো? বনহুরের চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। ডমীলুর কথাগুলো বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো বনহুরের কানের কাছে। বনহুর হাঁটু গেড়ে বসে ভালভাবে দেখছিলো ডমীলুর বুক চিরে। কিভাবে হৃৎপিণ্ডটা বের করে নেওয়া হয়েছে। তখন ডমীলুর দেহটা শক্ত আরষ্ট হয়ে যায়নি। চুলগুলো ছড়িয়ে আছে ধূলোমাটির মধ্যে। বনহুর দারুণ ব্যথা অনুভব করলো মনে, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় হৃদয় ভরে উঠলো।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বজ্রমুষ্টিতে কেউ তার ঘাড় চেপে ধরলো।

ফিরে তাকাবার ক্ষমতা লোপ পেলো বনহুরের। সে ঠিক বুঝে নিলো মাংসিয়াংতু তাকে আক্রমণ করেছে। অসুরের শক্তি নিয়ে তার ঘাড়টা চেপে ধরেছে। বনহুর কোনো শব্দ করবার পূর্বেই তাকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো, তারপর প্রচণ্ড এক ঘুষি মারলো।

বনহুর ছিটকে পড়লো হুমড়ি খেয়ে।

মাং সিয়াংতুর দিকে চাইতেই ভীষণ চমকে উঠলো বনহুর। তার দাঁত, ঠোঁট এবং মুখে রক্তমাখা, হাত দু'খানাও রক্তমাখা। বনহুর উঠে দাঁড়ালো এবং ক্ষিপ্রগতিতে একটি পাথরের খণ্ড তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো মাংসিয়াংতুর মাথা লক্ষ্য করে। বনহুর ভাবতে পারেনি পাথরখণ্ডটা মাং সিয়াংতুর ললাটে গেঁথে যাবে।

পাথরখণ্ডটার কিছু অংশ মাংসিয়াংতুর কপালের হাড় ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে কপাল চেপে ধরলো।

দুহাতের ফাঁকে রক্ত গড়িয়ে মাংসিয়াংতুর চোখমুখ নাক এবং বুক ভেসে চললো। নাকের ডগা দিয়ে রক্ত ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো নররাক্ষস মাংসিয়াংতু,তারপর টলতে টলতে এগুলো। দু'হাত বাড়িয়ে বনহুরকে ধরতে গেলো কিন্তু পারলো না, পা দু'খানা দুমড়ে মুচড়ে উবু হয়ে পড়ে গেলো সে।

মাংসিয়াংতুর এই করুণ অবস্থা বনহুরকে কিছুক্ষণের জন্য ভাবিয়ে তুললো। আর একটু হলেই মাংসিয়াংতু তাকে গলা টিপে হত্যা করতে এবং ডমীলুর বুক চিরে যেমন হৃৎপিণ্ড খেয়েছে তেমনি খেতো। ও এখন নরঘাতক হয়ে পড়েছে। পাথরের আঘাতটা দারুণভাবে লেগেছে মাংসিয়াংতুর মাথায়।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে আর একটা বড় একটা পাথর তুলে নিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে মাংসিয়াংতুর মাথায় আবার আঘাত করলো পর পর কয়েকবার। ওকে জীবিত রেখে কোনো লাভ হবে না বরং ওকে হত্যা করাটাই সমীচীন। বনহুর যে পাথরটা তুলে নিয়ে মাংসিয়াং এর মাথায় আঘাত করেছিলো সেটা অনেক বড় আর ভারী।

শেষ পর্যন্ত বনহুরের মাংসিয়াংতুর হাজার হাজার বছরের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালো। ডমীলুকে এভাবে হত্যা না করলে বনহুর হয়তো তাকে এ রকম নির্মমভাবে হত্যা করতো না। বনহুর বুঝতে পেরেছিলো মাংসিয়াংতু তাকে জীবিত রাখবে না। নিশ্চয়ই হত্যা করবে তাই মরিয়া হয়ে ওকে পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলো।

এবার বনহুর তাকিয়ে দেখলো নীরব হয়ে গেছে মাংসিয়াংতুর দেহটা। তাকালো বনহুর ওদিকে পড়ে থাকা ডমীলুর প্রাণহীন দেহটার দিকে ওর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি বাজতে লাগলো কানের কাছে। এই কবরগুহা থেকে আমাকে পৃথিবীর আলো বাতাসে নিয়ে যাবে আগন্তুক? নিয়ে যাবে? পারবে আমাকে ঐ নরপশু মাংসিয়াংতুর কবল থেকে রক্ষা করতে——

বনহুর বলে উঠলো আপন মনে-না না, পারলাম না তোমাকে বাঁচাতে ডমীলু তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না। বিদায় ডমীল, বিদায়—

*

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো রাজকুমারী মীরার। চোখ মেলে তাকাতেই দেখলো কে যেন তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। মীরা বললো—কে তুমি?

শান্ত, স্থির কণ্ঠস্বর–আমি মারাঠা ড্রাইভার।

আপনি এত রাতে আমার গৃহে কি করে প্রবেশ করলেন?

মীরা, তুমি তো জানো আমার বিচরণ সর্বত্র নেই, আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না।

আমি তা জানি। আপনি শুধু আমার নয়, আমাদের রাজ পরিবারের একজন হিতাকাংক্ষী। একবার নয়, কয়েকবার আপনি আমার ইজ্জত রক্ষা করেছেন। আমার আব্বা এ কারণে আপনাকে খুব সমীহ করেন। আব্বা বলেছেন, আপনি যা পুরস্কার চাইবেন তাই তিনি দেবেন। বসুন, আপনি যে দাঁড়িয়ে আছেন। এটা আমার চরম বেয়াদবি।

মীরা, আমি তোমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাই বিদায় নিতে এলাম, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে যা তোমাকে আমি বলতে এসেছি।

বলুন? বলুন মারাঠা ড্রাইভার। তবে আপনার কথা বলবার পূর্বে আমার একটি কথা আছে যা বলবো বলবো করেও বলা হয়নি। আজ না বলে পারছি না। একটু থামলো মীরা। একটু পূর্বের ঘুমের ঘোর কেটে গেছে তার। শয্যা ছেড়ে নেমে দাঁড়িয়েছে মেঝেতে। একটা আসন সামনে রেখে আবার বললো–বসুন। কেউ এ সময় আসবে না ঘরে।

বসলো মারাঠা ড্রাইভার।

মীরা খাটের পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললো—আমি প্রথমে স্মরণ করতে না পারলেও পরবর্তীতে স্মরণ করতে সক্ষম হয়েছি।

মারাঠা ড্রাইভারের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠলো, প্রশ্নভরা দু'চোখ মেলে তাকালো মীরার মুখের দিকে।

মীরার মুখোভাব শান্ত, প্রসন্ন, বললো সে–আমি আব্বার সঙ্গে আর্মান হুডের নিকটে একটি উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হয়ে দেখছিলাম বনহুরকে মিশরীয় বাহিনী কিভাবে পিরামিডটির অভ্যন্তরে বন্ধ করে রাখা হয়। বিস্ময় নিয়েই দেখছিলাম কারণ বনহুর সম্বন্ধে আমার মনে নানা ধরনের প্রশ্ন জেগে ছিলো।

বললো মারাঠা ড্রাইভার তারপর?

সব প্রশ্নের জবাব আমি পেয়েছিলাম।

কি রকম? বললো মারাঠা ড্রাইভার।

বললো মীরা—বনহুরকে যখন পিরামিড আর্মানহুডের মধ্যে নামানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন ক্ষণিকের জন্য তাকে দেখলাম—- আবারও থামালো মীরা।

মারাঠা ড্রাইভারের চোখে-মুখেও বিপুল এক জানার বাসনা। মীরা কি বলবে, কি বলতে চায় সে। ক্রমান্বয়ে মীরার মুখমণ্ডল করুণ ব্যথা-ভারাক্রান্ত হয়ে আসছিলো। চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত মনে হচ্ছিলো। বললো মীরা দেখলাম আপনাকে, মারাঠা ড্রাইভারের বেশে আজ যে আমার সামনে তিনিই হলেন স্বয়ং দস্যু বনহুর। হাঁ, প্রথমে খেয়াল করতে না পারলেও পরে পেরেছি। আমি যা শুনেছি, যে প্রশ্ন আমার মনকে উতলা করেছিলো, তার জবাব আমি পেয়েছি—— বনহুর—— হে দস্যুসম্রাট, আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বললো মারাঠা ড্রাইভারবেশী দস্যু বনহুর মীরা, তোমার আব্বাও কি—-

হাঁ দস্যুসম্রাট, আমার আব্বাও পরে জানতে এবং বুঝতে পেরেছেন। তিনি বলেছেন, মা মীরা, আমি জানতাম বনহুরকে কেউ কোনোদিন বন্দী করে রাখতে পারেনি এবং পারবেও না। যে তোমাকে ডাকু জঙ্গীশাহর কবল থেকে বার বার রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে সে সাধারণ মানুষ নয়, যাকে মিশরবাহিনী পিরামিডের অভ্যন্তরে আটক করে রেখেছিলো সেই ব্যক্তিই বেরিয়ে এসেছে এবং তোমাকে উদ্ধার করেছে।

মীরা!

হাঁ, আপনি পারেননি আমাদের চোখকে ধোকা দিতে। সত্যি বড় সাধ ছিলো আপনাকে কোনো না কোনো একদিন দেখবো। সে বাসনা আমার পূর্ণ হয়েছে দস্যুসম্রাট। আপনি বললেন চলে যাবেন আর সেই কারণেই আমার কাছে বিদায় নিতে এসেছেন।

হা মীরা, আমি চলে যাচ্ছি। আর তুমি যা সন্দেহ করেছে তা সত্যি–আমি বনহুর। তোমার আব্বার অনুমান সত্য, বনহুকে কেউ কোনোদিন বন্দী রাখতে পারেনি, ইনশাল্লাহ পারবেও না।

সত্যি, আপনার মহত্ত্বের তুলনা হয় না। আমার ভাগ্য প্রসন্ন তাই আপনার সহায়তা আমাকে ধন্য করেছে। যাবার পূর্বে আমার আব্বার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

তুমি আমার শুভেচ্ছা তাকে পৌঁছে দিও মীরা। আমি চাই না তাকে বিরক্ত করি। তবে হাঁ, একটা কথা আমি বলে যাবো, যে দায়িত্ব আমি তোমাকে দেবো তা পালন করতে তোমার আব্বার প্রয়োজন হবে। সম্রাটের সহযোগিতা ছাড়া হবে না সে কাজ। মীরা, রাতের অন্ধকারে আমি তোমার কক্ষে প্রবেশ করেছি, এটা আমার অপরাধ তবুও এসেছি। প্রথমে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বলল আমাকে তুমি ক্ষমা করেছো?

হে আমার শ্রদ্ধার জন, আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞই শুধু নই, আমি এবং আমার আব্বা ঋণী। আব্বা আপনার জন্য রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবেন, যা চাইবেন তিনি তাই দেবেন আপনাকে।

হাসলো বনহুর, তারপর বললো–মীরা, এই দেখো আমি কিছু মূল্যবান সামগ্রী এনেছি, এগুলো তুমি রেখে দাও। এ সম্পদের মূল্য কোটি কোটি টাকা। এই সম্পদের দ্বারা দেশের গরিব-দুঃখী, অসহায়ের উপকারে ব্যয় করতে বলল। একটু থেমে বললো বনহুর—জানি, সম্রাট বড় দয়ালু এবং ন্যায়পরায়ণ। আর সেই কারণেই আমি তার প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধাশীল। মীরা, রাজ-ভাণ্ডারের কোনো ধনরত্ন আমার প্রয়োজন হবে না। কথাটা বলে পকেট থেকে বের করলো একটি থলে, মীরার সম্মুখে বিছানার ওপরে থলের ভেতরের জিনিস ঢেলে দিয়ে বললো–এই নাও মীরা, এগুলো তোমার আব্বাকে দিও।

মীরার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। থলে থেকে বের করা মণি-মাণিক্য তার চোখ দুটোকে যেন ঝলসে দিলো। মীরা জীবনে বহু ধনসম্পদ, মণিমাণিক্য দেখেছে কিন্তু এত বেশি আর এমন মূল্যবান মনিমাণিক্য কোনোদিন দেখেনি। ঐ সব মূল্যবান মনিমাণিক্যের বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে সারা কক্ষে।

বললো মীরা এত মূল্যবান মনিমাণিক্য আপনি কোথায় পেলেন?

পেয়েছি যে পিরামিডের অভ্যন্তরে আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো এ সব সেই পিরামিডের অভ্যন্তরে রাজকন্যা ডমীলুর শবাধারে রক্ষিত ছিলো।

অবাক চোখে তাকালো মীরা বনহুরের মুখের দিকে। সব যেন বিস্ময়কর লাগছে। রাজকুমারী ডমীলু, কে সে?

মীরাকে নিশ্চুপ ভাবতে দেখে বনহুর বললো—জানি এসব দেখে তুমি অবাক হচ্ছো। ডমীলু হাজার বছর পূর্বের মিশরের কোনো সম্রাটের কন্যা। সে এক আশ্চর্য ঘটনা যা তুমি আমি কেউ বিশ্বাস করতে পারবো না।

হাজার বছর পূর্বের এই রাজকুমারীর শবাধারে এসব আপনি পেয়েছেন?

শুধু এই সব মহা মূল্যবান মণিমাণিক্যই নয় মীরা, ঐ আর্মানহুড পিরামিডের অভ্যন্তরে শবাধারে রাজকন্যাও জীবিত ছিলো।

দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বললো মীরা—হাজার বছর পূর্বের শবাধারে মৃত রাজকন্যা জীবিত? এ আপনি কি বলছেন।

হাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য এবং হাজার বছর পূর্বের নয়, তারও অধিক সময়ের হবে। শবাধারে তোমার মত রক্তমাংস দিয়ে গড়া সেই তরুণী আজও জীবিত ছিলো—-

তাহলে কি এখন সে জীবিত নেই?

না, তাকে হত্যা করা হয়েছে।

হত্যা করা হয়েছে?

সে এক মর্মস্পর্শী কাহিনী।

আপনি বলুন আমি শুনবো। বড় বিস্ময়কর ব্যাপার, আপনি বলুন দস্যুসম্রাট। এই আশ্চর্য কাহিনী বলুন!

বনহুর বললো—আমি মারাঠা ড্রাইভারের বেশে তোমার পাশে এসেছিলাম তাই তুমি আমাকে—-

ঠিক আছে তাই বলবো। বনহুর, তুমি আমার বন্ধু, আমার হিতাকাঙখী, কাজেই এমন একটা বিস্ময়কর কাহিনী বলবে না?

বলবো! বনহুর সমস্ত ঘটনা মীরার কাছে খুলে বললো। পিরামিডের অভ্যন্তরে বন্দী হবার পর বনহুর যা দেখেছিলো, সেই থেকে শেষ পর্যন্ত জানালো সে মীরার কাছে।

মীরা সব শুনে শুধু অবাকই হলো না, সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। বনহুর আরও বললো—মাংসিয়াংতুর মহা ওষুধের প্রশংসা না করে পারছি না। সত্যি ওর মৃত্যু না হলেই ভাল ছিলো। যদি কৌশলে মাংসিয়াংতুর কাছ থেকে ঐ মহাওষুধটি তৈরি করা শিখে নিতে পারতাম——

কিন্তু তা সম্ভব হতো না। মাংসিয়াংতু ডমীলুকে হত্যা করে তার হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ করার পর উন্মাদ হয়ে পড়েছিলো। আপনাকেও সে হত্যা করতো এবং আপনার হৃৎপিণ্ডও সে ভক্ষণ করতো। ওকে হত্যা করে আপনি ভালই করেছেন। একটি ভয়ংকর অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটলো।

কিন্তু মীরা, তুমি যদি ডমীলুকে দেখতে তাহলে বুঝতে কত অসহায় ছিলো সে। ডমীলু সুদীর্ঘ কাল ধরে আর্মানহুউ পিরামিডের অভ্যন্তরে একটি শবাধারে বন্দী ছিলো জীবিত অবস্থায়, তার কোনো আশা-বাসনা পূর্ণ হয়নি। বহুবার সে আমাকে বলেছিলো, আমাকে বাঁচাও, একটিবার পৃথিবীর সচ্ছ আলো বাতাসে আমাকে নিয়ে চলো আগন্তুক।

আপনি তার সে বাসনা পূর্ণ করেননি। পিরামিডের অভ্যন্তরে বন্দী থেকেও তো আপনি দিব্যি বাইরের জগতে ঘুরে বেড়াতেন।

হা মীরা, এ কথা সত্য। ইচ্ছা করলে পারতাম আর্মান হুডের অভ্যন্তর হতে তাকে বের করে আনতে কিন্তু সময়ের প্রয়োজন ছিলো, হয়তো আল্লাহতালা তার ভাগ্যে মুক্তি লেখেননি।

আপনি একজন প্রখ্যাত দস্যু হয়েও ভাগ্য বিশ্বাস করেন?

অবশ্যই করি। আমি একজন মুসলমান। আল্লাহ রাব্বল আলামিনকে বিশ্বাস করি, তার সৃষ্টিকে বিশ্বাস করি আর যে কারণেই আমি বিশ্বাস করি ভাগ্য। যাক ওসব কথা–শোন মীরা, এ সব মূল্যবান সম্পদ আমি মিশরীয় রাজকুমারী ডমীলুর শবাধারে পেয়েছি। এগুলোর যদি সদ্ব্যবহার হয় তাহলে ডমীলুর আত্মা শান্তি পাবে।

বলুন কি করতে হবে!

সম্রাটকে বলবে তিনি যেন এসব মণিমাণিক্য রাজভাণ্ডারে জমা না রেখে দীন-দুঃখী মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেন। এর বেশি আমার বুঝিয়ে বলতে হবে না। এবার তাহলে বিদায় মীরা!

সত্যি আপনি চলে যাচ্ছেন?

হাঁ, তবে তোমার দেশবাসী জানে দুস্য বনহুর আর্মানহুডের অভ্যন্তরে চিরকালের জন্য বন্দী আছে। হয়তো আবার দেখা হতেও পারে কোনো এক সময়। চলি মীরা, মনে থাকবে তোমার কথা।

বনহুর যে পথে জানালা দিয়ে প্রবেশ করেছিলো, সেই পথে বেরিয়ে গেলো।

মীরা ছুটে গেলো জানালার পাশে।

ভালভাবে লক্ষ্য করলো বনহুরকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না, শুধু অট্টালিকাগুলো নজরে পড়লো, নীরব প্রহরীর মত যেন দাঁড়িয়ে আছে।

মীরা শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো। মূল্যবান মণিমাণিক্যগুলো কক্ষের ডিমলাইটের আলোতে দীপ্ত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো।

সকাল হওয়ার অপেক্ষা না করে মীরা তখনি পিতার কক্ষে প্রবেশ করলো। আব্বা ওঠো, দেখো কি এনেছি!

সম্রাট কন্যার ডাকে জেগে উঠলেন, তিনি চোখ মেলতেই অবাক হলেন। মীরার হাতে একটি পাত্রে মণিমাণিক্য, হীরা জহরৎ। বললেন সম্রাট-মা, এ কোথায়

পেলে? এত মূল্যবান রত্ন কোথায় পেলে তুমি?

তোমার রাজভাণ্ডারের নয়। এগুলো পিরামিড আর্মানহুডের অভ্যন্তরে পাওয়া গেছে—-

বিস্ময় নিয়ে বললেন সম্রাট-মীরা, তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না মা।

শোনো আব্বা, সেই মহান পুরুষ এসেছিলেন, যিনি বার বার আমাকে নরপশু শয়তানদের কবল থেকে উদ্ধার করছিলেন।

সেই মারাঠা ড্রাইভার

হাঁ আব্বা, তিনি-কিন্তু——

বলো মা, থামলে কেন? আর এসবই বা মারাঠা ড্রাইভার কোথায় পেলো? আর তোমাকেই বা দিলো কেন?

আব্বা, প্রথমেই বলেছি এগুলো আর্মানহুড পিরামিডের গহ্বরে পাওয়া গেছে, আর তিনিই এনেছেন যিনি মারাঠা ড্রাইভার বেশে আমাদের কাছে পরিচিত।

সে এগুলো পেলো কিভাবে? হাঁ শুনেছি, আর্মানহুড পিরামিডের তলদেশে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে, আর সেই কারণেই ঐ পিরামিডের অভ্যন্তরে—-

দস্যু বনহুরকে বন্দী করার পরিকল্পনা করা হয়েছিলো।

হাঁ মা, এ কথা সত্য।

আব্বা, আসলে যিনি মারাঠা ড্রাইভার তিনিই সেই প্রখ্যাত দস্যু বনহুর।

মীরা!

হ আব্বা। একটু থেমে বললো মীরা—আব্বা আপনি তো বলেছেন দস্যু বনহুরকে কোনো শক্তিই আটকে রাখতে সক্ষম হয়নি, আর্মানহুড ওকে বন্দী করে রাখতে সক্ষম হবে কিনা সন্দেহ। আব্বা আপনার সন্দেহ সত্য, কারণ মারাঠা ড্রাইভারবেশী ব্যক্তিই স্বয়ং দস্যু বনহুর।

মা!

হাঁ, আর তিনিই এগুলো আমানহুডের অতল গহ্বর থেকে তুলে এনেছিলেন।

দস্যু বনহুর এই অমূল্য মণিমুক্তা হীরা—

আব্বা, একটি ব্যক্তিই দেখলাম যার মধ্যে লোভ-লালসা বলতে কিছু নেই। মহৎ এক ব্যক্তি তিনি—যাকে আপনারা সুকৌশলে মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই মহৎ উদার হৃদয় ব্যক্তিই এগুলো দিয়ে গেলেন, তিনিই এসব উদ্ধার করে এনেছেন। আব্বা, তিনি একজন দস্যু অথচ কত বড় তার হৃদয়। মিশরীয় সম্পদ তিনি নিয়ে যাবেন না, তাই তিনি এগুলো দিয়ে গেলেন, আব্বা সে অনেক কথা, আপনার ঘুমের অসুবিধা হবে না তো?

না মা, আমার ঘুম চলে গেছে। সব শুনবো বলো মা; মীরা বলো?

মীরা পিতার খাটের একপাশে বসলো। মূল্যবান মণিমাণিক্যগুলো রাখলো একপাশে।

সম্রাটের দু'চোখে বিস্ময়।

মীরা বনহুরের কাছে শোনা সমস্ত ঘটনা পিতার কাছে খুলে বললো। রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে মীরার কথা শেষ হয়না তবুও। মীরা বলে, আব্বা, এসব সম্পদ রাজভাণ্ডারে রাখা যাবে না, এগুলো ব্যয় হবে রাজ্যের দীন দুঃখী অসহায় মানুষদের জন্য। যারা বেকার, যাদের কোনো কর্মসংস্থান নেই তাদের জন্য কল-কারখানা, ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে হবে। আব্বা, আমি জানি মিশরবাসীদের জন্য আপনি অনেক করেছেন। সরাইখানা, আশ্রম, এতিমখানা হাসপাতাল, দাঁতব্য চিকিৎসালয় তবুও আরও করতে হবে। আমি নিজে তাকে কথা দিয়েছি আব্বা, বলুন আমার কথা রাখবেন?

হাঁ মা, তোমার কথাই শুধু নয়, আমার ইজ্জত রক্ষাকারী মহৎ ব্যক্তির ইচ্ছা আমি ইনশাল্লাহ পূর্ণ করবো। মা যা শুনলাম তা বিস্ময়কর। শুনেছি হীম শালিং পর্বতে অনেকেই একটি অদ্ভুত মানুষ লক্ষ করেছে। রাতের অন্ধকারে সে হীম শালিং পর্বতমালার কোনো গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতো এবং সন্ধানে এখানে সেখানে হানা দিত।

আব্বা, আমিও শুনেছি এ কাহিনী তবে বিশ্বাস করিনি। অবশ্যই আজ আমার বিশ্বাস হচ্ছে। সেই হাজার বছর পূর্বের মাংসিয়াংতু ছাড়া আর কেউ নয়। শুনেছিলাম কোনো কোনোদিন গভীর রাতে মিশর শহরেও সে নেমে আসতো এবং আচম্বিতে কোনো হোটেলে ঢুকে গোগ্রাসে খাবার খেতো। হীম শালিং পর্বতের অদূরে আর্মানহুডের গহ্বরেই ছিলো তার বাস তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মীরা, তোমার অনুমান সত্য। এটা এক আশ্চর্য কাহিনী। আমার মনে আজ নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। আজ যদি ডমীলুর মৃত্যু না ঘটতো তাহলে আমি তাকে আশ্রয়দান করতাম—

আব্বা, আমার মনও তার জন্য ব্যথাকাতর হচ্ছে। শয়তান মাং সিয়াংতু তাকে এতকাল জীবিত রেখে শেষ পর্যন্ত হত্যা করলো। তার হৃৎপিণ্ড চিবিয়ে খেয়েছে, বড় হৃদয় বিদারক দৃশ্য—-

কন্যার করুণ কণ্ঠ আর মুখোভাব সম্রাটকে ভাবিয়ে তুললো, তিনি বললেন মা মীরা, যা হবার হয়ে গেছে। ডমীলু বা মাংসিয়াংতু আর জীবিত হবে না। আল্লাহতালার নির্দেশমত তারা মৃত্যুবরণ করেছে। একটু থেমে বললেন–মারাঠা ড্রাইভার বেশী বনহুর যে অমূল্য সম্পদ তোমার কাছে দিয়ে গেছে তা সৎকাজে ব্যয় করবো। সত্যি লোভ-লালসাহীন সে, নইলে এই সম্পদ সে কখনও দিয়ে যেতো না। আমি তাকে অন্তর দিয়ে দোয়া করি।

আব্বা, কেন জানিনা বার বার তার কথা মনে হচ্ছে। আর কোনোদিন তিনি ফিরে আসবেন না এই মিশরে?

হয়তো আসবে সেদিন আমি আর থাকবেনা। সম্রাটের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে।

এখানে যখন সম্রাট ও তার কন্যা মিলে কথাবার্তা হচ্ছিল তখন বনহুর মিশর বিমান বন্দরে পৌঁছে গেছে। রানওয়ের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে বিমানখানা এগিয়ে আসছে।

*

বিমানখানা মিশর বিমান বন্দর ত্যাগ করতেই কে বা কারা মিশর পুলিশ বাহিনীর নিকটে টেলিফোন করলো—– এইমাত্র যে বিমানখানা মিশরীয় বিমান

বন্দর ত্যাগ করলো সেই বিমানে স্বয়ং দস্যু বনহুর অবস্থান করছে—— আর্মানহুডের গহ্বরে তাকে বন্দী করে রাখলেও সে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে —- আপনারা তাকে হিংছং মাইদি বিমান বন্দরে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রস্তুতি নিন ——

মিশরীয় পুলিশমহল সংবাদটা শোনার পর ভীষণ আশঙ্কিত হয়ে উঠলো। দস্যু বনহুরকে মিশরীয় পুলিশমহল কান্দাই পুলিশমহলের সহায়তায় গ্রেপ্তার করে বন্দী করে এবং তাকে আর্মানহুডের গঘরে বন্দী করে। মিশরীয়গণ ভাবতেও পারেনি বনহুর সেই ভয়ংকর আর্মানহুডের গহ্বর থেকে কোনোদিন বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে।

যে মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠলো সেই মুহূর্তে পুলিশ অফিসে ছিলেন জাদরেল পুলিশ সুপার মিঃ আলী। দুর্ধর্ষ ডাকু আর বদমাইশদের হৃদকম্প হয় মিঃ জং বাহাদুর আলীর নাম শুনে। এহেন মিঃ আলী যখন শুনলেন স্বয়ং দস্যু বনহুর আর্মানহুডের অভ্যন্তর হতে বেরিয়ে এসেছে এবং সে মিশরীয় বিমানবন্দর থেকে হিংছং মাইদির উদ্দেশ্যে বিমানে রওয়ানা হয়ে গেছে। তখন শুধু অবাকই হননি তিনি বেশ ঘাবড়েও গেলেন, কারণ বনহুরকে আর্মানহুডের গরে বন্দী করার ব্যাপারে তার সহযোগিতা ছিলো সবচেয়ে বেশি। বনহুর শুধু কান্দাইবাসিগণের ভীতির কারণ ছিলো না সে সমস্ত পৃথিবীর মানবকুলের আতংক ঐ নাম শুনলে সবাই আতঙ্কিত হয়, কারণ বনহুরের বিচরণ বিশ্বের সর্বস্থানে। এহেন ব্যক্তিকে কে না ভয় করে। মিঃ আলী বনহুরকে তার আয়ত্তে আনতে পেরে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। হঠাৎ এ সংবাদ তাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুললো।

তিনি মুহূর্ত বিলম্ব না করে বেশ কয়েকজন পুলিশপ্রধানকে সঙ্গে নিয়ে মিসর বিমান বন্দরে রওয়ানা দিলেন। যেমন করে থোক বনহুরকে পুনরায় গ্রেপ্তার করতেই হবে।

মিঃ আলী যখন বিমান বন্দরে পৌঁছলেন তখন তার অপেক্ষায় বিমান বন্দরে প্রতীক্ষা করছিলেন মিশরীয় প্রখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ লুইয়া সিন্ধ। তিনিও তার দু'জন সঙ্গী মিঃ আলীকে অভ্যর্থনা জানালেন। মিঃ সিন্ধ বললেন–মিঃ আলী কে বা কারা আমাকে টেলিফোনে জানালেন কয়েক মিনিট পূর্বে যে বিমানখানা মিশরীয় বিমান বন্দর ত্যাগ করেছে সেই বিমানে যাচ্ছে স্বয়ং দস্যু বনহুর তাকে গ্রেপ্তারের জন্য সতর্ক করে দেওয়া হলো।

মিঃ সিন্ধের কথা শুনে মিঃ আলীর মনে আরও বিস্ময় জাগলো, তিনিও একই উক্তি উচ্চারণ করলেন। তবে কে সেই ব্যক্তি যে বনহুর সম্বন্ধে সব অবগত আছে।

মিঃ আলী বললেন–কথাটা মিথ্যা হতে পারে। কোনো দুষ্ট ব্যক্তি তামাশা করে এভাবে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

অবশ্য এ রকম ধারণা করা যায় তবুও সন্ধান নেওয়া একান্ত দরকার মনে করছি। কথাটা বললেন মিঃ সিন্ধ।

এমন সময় একটা বয় এসে বললো—-স্যার, এই চিঠিখানা আপনাকে দেওয়ার জন্য একজন দিলেন।

মিঃ আলী চিঠিখানা হাতে নিয়ে খাম ছিঁড়ে বের করে পড়লেন। লাল রঙের একটি চিঠি। তাতে লেখা আছে, বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে হলে এক্ষুণি আপনারা হিংদং মাইদি বিমান বন্দরে যোগাযোগ করুন। –সাবধানকারী।

মিঃ আলী তাকালেন বয়টির সন্ধানে কিন্তু বয় তখন নেই। কোথায় চলে গেছে কে জানে।

বয় মিঃ আলীর হাতে চিঠিখানা দেবার পর সবাই সেই চিঠি খানার দিকে লক্ষ্য করছিলো সেই ফাঁকা সে উধাও।

অনেক খোঁজা খুঁজি করেও আর তাকে পাওয়া গেলো না।

মিঃ আলী সম্রাট আবদুল্লাহর নিকটে ওয়্যারলেসে সংবাদ জানালেন।

সম্রাট আবদুল্লাহ তার বিশ্রামকক্ষের ওয়্যারলেসে কথা বললেন। বিমান বন্দর থেকে, বলছিলেন মিশরীয় পুলিশ সুপার মিঃ আলী।

যখন ওয়্যারলেসে কথা হচ্ছিলো তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে মীরা সব শুনছিলো। বিশ্রামকক্ষে পিতা কার সঙ্গে আলাপ করছেন জানার প্রবল বাসনা হলো তার।

মিঃ আলীর কথায় সম্রাট জবাব দিচ্ছেন, তিনি বললেন–দস্যু বনহুর মিশরীয় বিমান বন্দর ত্যাগ করেছে–এ কথা কি করে জানালেন।

জবাব শুনতে পেলো না মীরা। তবুও কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো। সে শুনতে পেলো। পিতার কণ্ঠস্বর, কে বা কারা আপনাকেই শুধু নয় প্রখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ সিন্ধকেও জানিয়েছেন? শুনে আমি বিস্ময় প্রকাশ করছি—— ঠিক আছে যদি হিংছং মাইদি না না, আমার কোনো অমত নেই— হাঁ, আমি সম্মতি দান করছি——ওয়্যারলেস রেখে দিলেন সম্রাট।

মীরার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো, তার আব্বা বনহুরের সম্বন্ধে সব জেনেও তাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। যে ব্যক্তি একবার নয় দু'বার মীরার ইজ্জত রক্ষা করেছে এমন কি মিশরের সব চেয়ে দুর্ধর্ষ ডাকু জঙ্গীশাহকে সমূলে ধ্বংস করেছে। জঙ্গী শাহর অকথ্য অত্যাচারে মিশরবাসিগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো সেই নরপশুকে কাহিল করার সাধ্য ছিলোনা মিশরীয় পুলিশ বাহিনীর। এমন এক কুখ্যাত ডাকুকে যে হত্যা করে মিশরবাসিগণকে মুক্তির আস্বাদ দান করেছে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এ যেন মীরার কাছে অসহনীয়। মুহূর্ত বিলম্ব না করে মীরা পিতার কক্ষে প্রবেশ করলো।

সম্রাট কন্যার মুখে দৃষ্টি রেখে বললেন–মীরা তুমি এই অসময়ে। কি সংবাদ মা?

সংবাদ তত আপনার কাছে আব্বা! এক্ষুণি যে কথাগুলো আপনি বলেন সব আমি শুনেছি। যে ব্যক্তির কাছে আপনি ঋণী, যে আপনার কন্যার ইজ্জত রক্ষা করেছে নিজ জীবন বিপন্ন করে, যে মিশরীয় দুর্ধর্ষ ডাকু জঙ্গীশাহকে খতম করে মিশর বাসীকে আতঙ্কমুক্ত করেছে সেই মহান ব্যক্তিকে বন্দী করার নির্দেশ দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ হলো না আপনার?

কন্যার কথায় লজ্জায় কুঁকড়ে গেলেন সম্রাট আবদুল্লাহ। যে কথাগুলো মীরা শুনেছে তা কি তার মনের কথা? তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না ঐ মারাঠা ড্রাইভারবেশী বনহুরের দানের কথা। তবুও তিনি যেন কলের পুতুলের মত এ ব্যাপারে। বললেন তিনি–জানিনা মা কি করে মিশর পুলিশমহল জানতে পেরেছে বনহুর জীবিত মা কি করে মিশর পুলিশমহল জানতে পেরেছে বনহুর জীবিত এবং সে মিশর বিমান বন্দর ত্যাগ করে হিংছং মাইদি বিমান বন্দর অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছে—-

আব্বু, এ কথা একমাত্র আপনি আর আমি ছাড়া কেউ জানে না। আর্মানহুডের গহ্বর থেকে সে বেরিয়ে এসেছে এ কথাও শুধু আমি আর আপনি জানেন।

মীরা বিশ্বাস করো মা আমি কাউকে জানাইনি। যখন ওয়্যারলেসে মিঃ আলী আমাকে জানালেন তখন আমি ভীষণ অবাক হয়েছিলাম, কি করে তারা এ কথা জানতে পারলো। আমি নিজের মনোভাব গোপন রেখেই তার সঙ্গে ওয়্যারলেসে কথা বলছিলাম। বিশ্বাস করো মা, আমি একথা জানাতে পারি না, কারণ বনহুর যত অপরাধীই হোক সে আমাদের পরম বন্ধু। শুধু বন্ধুই নয়, একান্ত হিতাকাঙ্খী ব্যক্তি। আমার ইজ্জত মান-সম্মান রক্ষা করেছেন এ ছাড়া যে অমূল্য ধনরত্ন সে বিনা দ্বিধায় মিশরবাসীদের কল্যাণে দান করে গেছে তা কোনদিনই ভুলবার নয়—-

আব্বা, তাহলে কেন আপনি তাকে গ্রেপ্তারের অনুমতি প্রদান করলেন? মীরা গম্ভীর কণ্ঠে কথাগুলো বললো।

সম্রাট বললেন–আমি দায়িত্বশীল সম্রাট। ভেবে দেখো মীরা আমি কেন তাকে গ্রেপ্তারের অনুমতি দিয়েছি। এখানে আমাকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে হচ্ছে।

না, আপনি এত নির্মম হৃদয় হতে পারেন না আব্বা। কারণ বনহুর আপনার বা আপনার রাজ্যের কোনো ক্ষতিসাধন করেনি। বরং সে মিসরবাসীদের মঙ্গল সাধন করেছে। কোটি কোটি টাকা মূল্যের ধনসম্পদ সে তুলে দিয়ে গেলো আপনার হাতে। আমি জানি যে, কোনো ব্যক্তিই ঐ মণি মাণিক্য হীরা জহরতের লোভ-লালসা সংবরণ করতে পারতো না। কত বড় মহান হৃদয়ের পরিচয় সে দিয়ে গেছে।

সব বুঝি মা, সব জানি, তবুও আমি যেন কিছুই জানি না। মীরা, বনহুরকে যখন আর্মানহুডের গহবরে বন্দী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো তখন আমি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ আমি আগে থেকেই জানতাম বনহুর সত্য আর ন্যায়ের প্রতীক। যদিও সে একজন ভয়ংকর দস্যু তবুও তার চরিত্র ছিলো মহৎ মহান পবিত্রময়—

আব্বা! আব্বা আপনি তার সম্বন্ধে পূর্ব হতেই জানতেন? জানতেন তার মহৎ চরিত্রের কথা?

আমি কেন, এ বিশ্বের প্রায় সবাই জানে বনহুর এক বিস্ময়কর মানুষ। তার মত মহৎ মহান চরিত্রের মানুষ আর হয় না। তার অপরূপ সৌন্দর্যের কথাও আমি শুনেছিলাম তবুও আমি বাধ্য হয়েই সম্মতি দিয়েছিলাম। তা ছাড়া আমার কোনো

উপায় ছিলো না। মীরা, তুমি জানো না মা, রাজদায়িত্ব কত কঠিন। নিজ সন্তান যদি অপরাধী হয় তাকে ক্ষমা করার কোনো উপায় নেই। বিচারে যে শাস্তি সে পাবার যোগ্য হবে তাই তাকে দিতে হবে। বনহুরের চেহারা আমি না দেখলেও তার সম্বন্ধে আমার এমন একটা ধারণা ছিলো যা আমার মনকে মাঝে মাঝে বিচলিত করতো। মীরা সত্য বলছি মা, অনেক সময় বিবেকের অমতেও রাজকার্য পরিচালনা করতে হয়।

মীরার মুখোভাব কিছুটা প্রসন্ন হয়ে এলো, সে অন্তর দিয়ে পিতার কথাগুলো উপলব্ধি করলো। অনেক সময় রাজকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে সম্রাট আবদুল্লাহ নিজের বিবেকের কাছে দংশিত হয়েছে মীরা তা জানে, পিতার ব্যথাভরা শান্ত কণ্ঠস্বর তাকে বিচলিত করলো, তবুও বললো মীরা—আব্বু, আপনি কি পারেন না মিঃ আলী এবং অন্যদের বনহুরকে গ্রেপ্তার থেকে বিরত রাখতে?

তা হয় না মীরা। বনহুর আমার পরম বন্ধু হতে পারে কিন্তু আসলে সে অপরাধী আইনের চোখে। তাকে দণ্ড দেওয়া পুলিশমহলের কর্তব্য–

আব্বা, তাই বলে আপনি ওর জন্য কিছু করতে পারবেন না?

না। তবে আমি দোয়া করবো আল্লাহতায়ালা তার মঙ্গল করুন। মীরা, বনহুরের অমঙ্গল হবে না, আমি জানি সে সত্যিকারের একজন মহৎপ্রাণ মানুষ।

মীরার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এলো।

*

হিংছং মাইদি বিমান বন্দরের আকাশে মিশরীয় বিমান পৌঁছানোর পূর্বেই মাইদি পুলিশবাহিনী বিমান বন্দর ঘিরে ফেললো। ওয়্যারলেসে মিশরীয় পুলিশমহল মাইদির পুলিশমহলকে সতর্ক করে দিয়েছে, তাই মাইদি পুলিশ এবং গোয়েন্দামহল সকলে সজাগ ও প্রস্তুত হয়ে বিমান বন্দর ঘিরে রাখলো।

বিমানখানা এক সময় বন্দরে অবতরণ করলো।

পুলিশবাহিনী ততক্ষণে ঘিরে ফেলেছে বিমান বন্দর এবং আশে-পাশের পথগুলো। সবাই অস্ত্র হাতে তৈরি রয়েছে বনহুর যেন পালাতে না পারে। মিশরীয়

পুলিশমহল ওয়্যারলেসে মাইদি পুলিশ-মহলকে দস্যু বনহুরের দুর্ধর্ষতা আর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে, কাজেই বনহুর সম্বন্ধে ভীষণ সজাগ রয়েছে তারা।

যাত্রীবাহী বিমানখানা বিমান বন্দরে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী বিমানে উঠে পড়লো। কিন্তু কোথায় দস্যু বনহুর, বিমানে চারজন চালক এবং দু'শ যাত্রী রয়েছে। দস্যু বনহুর কই? তবে কি এই যাত্রীদের মধ্যেই কেউ দস্যু বনহুর?

সতর্ক পাহারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় যাত্রিগণকে বিমানের চেক রুমে নেওয়া হলো। এখানে পুলিশ ডিকেকটিভ এবং সৈনিক বিভাগের প্রধান এক একজন যাত্রীকে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালাতে লাগলেন এবং সন্দেহমুক্ত হওয়ার পর মুক্তি দিতে লাগলেন। মিশরীয় পুলিশবাহিনী ওয়্যারলেসে বনহুরের যে বর্ণনা দিয়েছিল সেই বর্ণনা অনুযায়ী সবাইকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার পর পুনরায় বিমানে আরোহণ করার অনুমতি দেওয়া হলো।

মাইদি বিমান বন্দর থেকে মিশরীয় যে বিমানখানাকে নিয়ে এত সতর্কবাণী প্রেরণ করা হয়েছিলো সেই বিমান পুনরায় তার সব যাত্রী নিয়ে আকাশে উড়লো। সমস্ত বিমানে পুত্থান পুঙ্খরূপে তল্লাশি চালিয়েও কোথাও বনহুরকে পাওয়া গেলো না।

বিমানের চারজন চালক এবার তাদের বিমান নিয়ে রায়হান বিমান বন্দর অভিমুখে রওয়ানা দিলো। বিমানবালার কণ্ঠ ভেসে এলো, আপনারা এখন বিপদমুক্ত। আমাদের বিমান সন্ধ্যা ছ'টায় রায়হান বিমান বন্দরে পৌঁছে যাবে। আপনারা নিজ নিজ আসনে স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করতে পারেন। অপর এক বিমানবালা যাত্রীদের হাতে পত্রিকা দিয়ে গেলো।

আকাশ স্বচ্ছ পরিষ্কার।

হিংছং মাইদি বিমান বন্দরে সুউচ্চ দালানকোঠাগুলো ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে। বিমানের দু'পাশে হাল্কা শুভ্র মেঘগুলোকে পেঁজা তুলোর মত মনে হচ্ছে। কয়েকজন যাত্রীর মনে এখনও বনহুরের আতঙ্ক উঁকি দিচ্ছিলো। তাই প্রত্যেকে তারা নিজেই পাশের আসনের যাত্রীদের দিকে সন্দিহান দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছিলো।

বিমানখানা হাল্কা মেঘের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, মাঝে মাঝে জাম্পিং হচ্ছিলো বিমানখানায়। স্বচ্ছ সূর্যের আলোকরশ্মি পেঁজা তুলোর মত মেঘের গায়ে রূপালি আলোর ঝিলিক সৃষ্টি করছিলো।

বিমানের প্রধান চালক মিঃ আরবার্ড তখন আসনে বসে বিমান চালাচ্ছেন। তাকে সহযোগিতা করছেন তার তিনজন সহকারী।

ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে বিমানখানা এখন বহু ওপর দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিমানবালাদের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে বিমান এখন ভূপৃষ্ঠ হতে কত ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছে, কোন শহর বা কোন স্থান অতিক্রম করছে, আবহাওয়া কেমন সবকিছু ইংরেজী এবং মিশরীয় ভাষায় প্রচার করা হচ্ছে। মিশরীয় বিমানখানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সময় মাইদি বিমান বন্দরে কিছু মালামাল অবতরণ করানো হয়েছিলো। ঐ মালামাল গুলো ছিলো মাইদি বিমান অফিসের প্রয়োজনীয় কিছু মেসিনারী সরঞ্জাম।

মালামাল মিশর থেকে মাইদি এসেছে। ওগুলো গুদামের বারান্দায় রাখা হয়েছে। বিমানখানা চলে যাবার পর মালামাল গুদামে ওঠানোর সময় হঠাৎ একটি প্যাকেট লক্ষ্য করে একজন কর্মচারী বিস্মিত হলো। তার আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন সেখানে জমা হলো। প্যাকেটটি খুলে ফেলতেই দেখা গেলো একটা প্যাকেটের ভেতরে সংজ্ঞাহীন এক ব্যক্তি। মুহূর্তে মাইদি বিমান বন্দরে একটা হৈ চৈ পড়ে গেলো, সবাই ধারণা করলো, এই ব্যক্তিই দস্যু বনহুর।

সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তার হাতে হাতকড়া পরানো হলো এবং কড়া পাহারায় বন্দীশালায় তাকে আটকানো হলো। বন্দীশালার চারপাশে সশস্ত্র প্রহরী দণ্ডায়মান রইলো, সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির সংজ্ঞা ফিরে এলে সে যেন পালাতে সক্ষম না হয়।

সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির পরনে শুধু গেঞ্জি আর ছোট্ট প্যান্ট। সুন্দর বলিষ্ঠ মুখম চেহারা। তারা বনহুর সম্বন্ধে পূর্ব হতেই যা শুনেছে সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির চেহারায় তা প্রকাশ পাচ্ছে। কাজেই এই ব্যক্তিই যে বনহুর তাতে কানো ভুল নেই।

মাইদি বিমান বন্দরের বন্দীশালা অত্যন্ত মজবুত ছিলো। তবুও সেখানে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা হলো। দস্যু বনহুর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঐ বন্দীশালায় অবস্থান করছে। অনেকেই তাকে দেখার জন্য ভীড় জমাচ্ছে। চারদিকে মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়লো, মাইদি বিমান বন্দরে দুর্দান্ত দস্যু বনহুকে সংজ্ঞাহীন

অবস্থায় পাওয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিক ও ক্যামেরা ম্যানেরা উপস্থিত হলেন বিমান বন্দরে।

ওয়্যারলেসে এই সংবাদ পাঠানো হলো মিশরীয় পুলিশ প্রধান মিঃ আলীর অফিসে।

এহেন সংবাদ মুহূর্তে টেলিভিশন এবং রেডিওর মাধ্যমে মিশরবাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলো। সম্রাট আবদুল্লাহ রাজসভায় বসে রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন, সেখানেও সংবাদ এসে পৌঁছলো।

রাজঅন্তপুরেও খবর পৌঁছে গেলো বনহুর হিংছং মাইদি বিমান বন্দরে আটকা পড়েছে। মীরার মনে দারুণ আঘাত লাগলো। তার সব-রাগ অভিমান গিয়ে পড়লো পিতার ওপর। সম্রাটই হয়তো এ কথা মিশরীয় পুলিশমহলকে জানিয়েছেন, নাহলে কে জানালো। বনহুর বিদায়কালে একমাত্র মীরার কাছেই জানিয়ে ছিলো, সে চলে যাচ্ছে। আর মীরা জানিয়েছিলো তার পিতা সম্রাট আবদুল্লাহর কাছে, মূল্যবান সামগ্রীগুলো দেওয়ার সময়। কিন্তু পিতাকে মীরা অবিশ্বাস করতে পারে না। তিনি নিজে বলেছেন পুলিশমহলকে তিনি জানাননি। তবে কে বা কারা জানালো?—— মীরার মনটা অস্থির হয়ে উঠলো। যদিও মীরা জানতো আর কোনোদিন বনহুরের সঙ্গে তার দেখা হবে না তবুও তার জন্য ওর মনে গভীর সহানুভূতি জাগছিলো, বনহুরের মঙ্গল কামনাই ছিলো তার লক্ষ্য। কারণ বনহুর তার মান-সম্মান, সতীত্ব রক্ষা করেছে। বনহুরের উপকার সে জীবনে ভুলতে পারবে না।

মীরা বিষণ্ণ মনে পাশের কক্ষে গিয়ে মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। হঠাৎ তার কানে ভেসে এলো রাজপরিবারের এক কর্মচারীর চাপা কণ্ঠস্বর, বলছে সে রাজকুমারীর কক্ষে যখন লোকটা প্রবেশ করলো তখন আমি তাকে দেখতে পাই। আমি তাকে অনুসরণ করে রাজকুমারীর কক্ষের দরজায় কান পেতে দাঁড়াই—

অপর একটি কণ্ঠস্বর-তারপর?

আমি শুনতে পেলাম সেই অজানা ব্যক্তি আর রাজকুমারীর মধ্যে কিছু কথাবার্তা হচ্ছিলো। সব কথা বোঝা না গেলেও আমি বুঝতে পারলাম রাজকুমারীর কক্ষে যে ব্যক্তি গভীর রাতে প্রবেশ করেছিলো সে স্বয়ং দস্যু বনহুর ——

অপর কণ্ঠ-সত্যি দস্যু বনহুর তাহলে—-

হাঁ, আর্মানহুডের অভ্যন্তর থেকে বনহুর বেরিয়ে এসেছিলো এবং সম্রাটকন্যাকে সেই নাকি শকবল থেকে রক্ষা করেছিলো তাহলে?

হাঁ, আমি নিজের কানে সব শুনেছি এবং আরও শুনেছি বনহুর ঐ দিনই বিমানে হিংছং মাইদি বিমান বন্দর অভিমুখে রওয়ানা দেবে।

তাহলে তুমিই সংবাদটা মিশর পুলিশ অফিসে টেলিফোন করে জানিয়েছিলে?

হাঁ, আমিই সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করেছি। কারণ যাকে বন্দী করার জন্য মিসরবাসীদের এত চেষ্টা আর সেই কিনা—

মীরার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেলো। পিতার ওপর তার সন্দেহ এসেছিলো, নিশ্চয়ই তিনিই মিশরীয় পুলিশ বাহিনীর কাছে বনহুর সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন এবার সে ভুল ভেঙে গেলো। রাজকর্মচারী হানিফ সিং এই সংবাদ গোপনে পুলিশ প্রধানকে দিয়েছে। রাগে গা জ্বালা করে উঠলো মীরার।

পিতাকে বলে মীরা পরদিনই হানিফ সিংকে তার পদ থেকে অপসারণ করলো। সম্রাট আবদুল্লাহ কন্যার কথা না রেখে পারলেন না, কারণ মীরা বড় আদরের মেয়ে তা ছাড়া বড় জেদী। অবশ্য হানিফ সিং এই সংবাদ সম্রাটের অনুমতি ছাড়াই পুলিশ মহলে জানানোর অপরাধে তার চাকরিচ্যুতি ঘটলো।

হানিফ সিং চাকরিচ্যুত হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, সে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো মীরার ওপর। প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করলো সে মনে মনে।

মিসরীয় পুলিশমহল যখন বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ জানতে পারলো তখন তারা মনে ভীষণ আনন্দ বোধ করলো। মিঃ আলী মিঃ সিন্ধ রওয়ানা দিলেন আরও কয়েকজন সহচর সহ মাইদি বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে।

ওদিকে সংজ্ঞা ফিরে এসেছে মাইদি বিমান বন্দরে দস্যু বনহুর সন্দেহে আটক ব্যক্তির। বিমান বাহিনী প্রধান এলেন, তিনি তাকে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন, একি, এ যে মিশরীয় বিমানের পাইলট মিঃ আহসান হোসেন। তিনি কি করে এই মালের প্যাকেটের মধ্যে এলেন?

লজ্জা-ক্ষোভে এতটুকু হয়ে গেলেন প্রখ্যাত পাইলট আহসান হোসেন। কেমন করে তার এ অবস্থা হলো তাও তিনি জানেন না। পাইলট মিঃ হোসেনকে আটক করা হয়েছিলো বনহুর সন্দেহে–এ কথা পুনঃ প্রচার হলো মাইদি শহরে বন্দরে সর্বস্থানে, এমন কি মিশরেও এ সংবাদ পৌঁছে গেলো বেতারে।

এমন একটা ঘটনা ঘটবে কেউ ধারণা করেনি। সবাই হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। শহর বন্দর নগরে ঐ একই কথা। বনহুরকে বন্দী করা এত সহজ নয়। বনহুরকে বন্দী করতে গিয়ে বন্দী হলেন প্রখ্যাত পাইলট মিঃ আহসান হোসেন।

স্বনামধন্য মিশরীয় পুলিশপ্রধান মিঃ আলী এবং তার দলবল যখন হিংছং মাইদি বিমান বন্দরে পৌঁছলেন তখন পাইলট মিঃ হোসেনের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তারা বিপুল আশা আর উদ্যম নিয়ে মাইদি পৌঁছে যখন আসল সংবাদ জানতে পারলেন তখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। হায়, কোথায় তারা বনহুরকে গ্রেপ্তার করে পুনরায় মিশরে ফেরত নিয়ে যাবেন। কিন্তু সে আশা বিফল হলো।

*

গভীর রাত।

কান্দাই সাগর অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে জাহাজ ঈগল! খোলের মধ্যে রয়েছে বেশকিছু খালি ড্রাম। এই ভ্রামগুলো ভর্তি ছিলো যখন ঈগল কান্দাই থেকে বিদেশ অভিমুখে রওয়ানা দিয়ে ছিলো। দীর্ঘ এক মাস পর ফিরে চলেছে ঈগল তার খোলসে শূন্য ড্রামগুলো নিয়ে।

মিঃ গডসে ঈগলের ক্যাপ্টেন মিঃ নাথুয়া রোখকে ওয়্যারলেসে নির্দেশ দিচ্ছিলো। মালামাল পাচার করার পর জাহাজ ঈগলশূন্য ভাণ্ডার নিয়ে ফিরে আসছে। পথে কোন নিদারুণ অবস্থার শিকার হয়নি এজন্য মিঃ গডসের আনন্দের সীমা নেই। তার বাসভবনে চলছে বিরাট আনন্দ উৎসব। কান্দাই শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। এমনকি মিঃ কিবরিয়া এবং আরও কয়েকজন পুলিশ প্রধানও আজ আমন্ত্রিত হয়েছেন মিঃ গডসের বাসভবনে। এ কথা নতুন নয়, প্রায়ই মিঃ গডসে কান্দাই এর স্বনাম ধন্য ব্যক্তিদের নিয়ে জলসা করে থাকে। খানাপিনা, নাচ-গান এ সব প্রায়ই লেগেই থাকে গডসে মহলে।

জাহাজ ঈগল এবার সাফল্য লাভ করেছে। মালামাল উৎরে দিয়ে ললাটে জয়টিকা পরে ফিরে আসছে ঈগল। ঈগলের চালকদের মধ্যে অনেকেই জানত ঈগলের অভ্যন্তরের গোপন কার্য কালাপের কথা। হেড চালক এবং ক্যাপ্টেন ছাড়া মিঃ গডসের সঙ্গে ব্যবসা ব্যাপারে কোন আলাপ হয় না আজও ওয়্যারলেসে কথা হয়েছে ক্যাপ্টেন মাথুয়ারোসের সঙ্গে। প্রায় পাঁচ কোটি টাকার মালামাল আসছে, খালি ড্রামগুলোর তলদেশে। এইসব মালামাল এসে পৌঁছলে গডসের জীবনে আসবে আর একটি পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনের জন্যই গডসে প্রতীক্ষা করছে।

কিছুক্ষণ পূর্বে ঈগলের ক্যাপ্টেন ওয়্যারলেসে জানিয়েছে এ সপ্তাহের মধ্যেই তাদের জাহাজ ঈগল কান্দাই বন্দরে পৌঁছে যাবে।

ফাংশন চলছে।

আলো ঝলমল মিঃ গডসের বাড়িখানা নানা ধরনের নারী-পুরুষের কলরবে মুখর। মিউজিকের শব্দ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা হলঘরে।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে ভেসে আসে সাংকেতিক শব্দ।

মুহূর্তে গডসের মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়লো, তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

ওপাশে বসেছিলো তার প্রধান সহচর, সেও আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

মিঃ গডসে দ্রুত পাশের কক্ষে গেলে এবং ওয়্যারলেসের সাউন্ড বক্স তুলে নিলো হাতে। জাহাজ ঈগল থেকে ক্যাপ্টেন রোমের গলা ভেসে এলো, আতংক আর ভয়াল, কণ্ঠস্বর—– মালিক, আমি পারলাম না ঈগলকে রক্ষা করতে—– আমাদের জাহাজ যখন কান্দাই আর জাগুল মোহনার কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন একটি ডুবন্ত সাবমেরিন আমাদের জাহাজের তলদেশে ফেঁসে দিয়েছেন, জাহাজ ঈগল তলিয়ে যাচ্ছে—-মালিক এখন আমাদের রক্ষা আর কোনো উপায় নেই—-মালিক—-

ক্যাপ্টেন রোম, এ তুমি কি বলছো? ভীষণ উৎকণ্ঠা আর হতাশা নিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললো মিঃ গডসে।

ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার কয়েকজন সহচর।

ওয়্যারলেসে বিপদপূর্ণ সাংকেতিক শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ গডসের অনুচরগণ বুঝতে পেরেছিলো কোনো বিপদ তাদের জন্য এগিয়ে এসেছে।

ওরা সবাই মালিকের মুখের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। ও ঘর থেকে ভেসে আসছে মিউজিকের সুমিষ্ট সুর। তার সঙ্গে নারী আর পুরুষকণ্ঠের গল্পের শব্দ।

একটু পরই টেবিলে খাবার দেওয়া হবে।

সবার মনে আনন্দের উৎস।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজখানা তলিয়ে যাবার বিকট শব্দ ওয়্যারলেসে ভেসে এলো, তখনও শোনা যাচ্ছিলো ক্যাপ্টেন রোমের ভয়বিহ্বল কণ্ঠস্বর। মিঃ গডসের হাতে ওয়্যারলেসের সাউণ্ড বক্স ধরা আছে, ফ্যাকাশে রক্তহীন মিঃ গডসের চেহারা।

অনুচরগণ কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কিছুটা আঁচ করলেও সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনি। কি ঘটে গেলো বা গেছে বুঝবার পূর্বেই মিঃ গডসে সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়লো।

ওয়্যারলেসের মুখ রেখে বাষ্পরুদ্ধ হতাশ গলায় মিঃ গডসে বললো–ক্যাপ্টেন রোম ক্যাপ্টেন নোম ক্যাপ্টেন রোম– ওয়্যারলেসের সাউণ্ডবক্সটা মিঃ গডসের হাত থেকে খসে পড়লো।

*

রহমান চাচা, জাভেদ হয়তো আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

কথাটা ব্যথাভরা কণ্ঠে বললো নূর।

রহমানের মাথায় কে যেন বজ্রাঘাত করলো। বিস্ময় আর কান্নাভরা কণ্ঠে বললো রহমান—ছোট সাহেব, এ তুমি কি শোনালে?

হাঁ রহমান চাচা, জাভেদ হয়তো বেঁচে নেই। কারণ সে নিজে সাবমেরিন নিয়ে কান্দাই সাগরে ঈগল ধ্বংসের কাজে এগিয়ে গিয়েছিলো।

ছোট সাহেব, আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। জানতাম জাভেদ নাকি গোপনে তোমার বাংলোয় যেতো।

হাঁ, সে প্রায়ই আমার বাংলোয় যেতো। যেদিন থেকে সে জানতে পেরেছিলো আমি তার সহোদর সেদিন থেকেই

ছোট সাহেব!

রহমান চাচা, আমিও ভাবতে পারিনি জাভেদ কোনোদিন ওভাবে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে আমাকে সহায়তা করতে। রহমান চাচা, বসো তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

পাশাপাশি দুটো পাথরখণ্ডে বসলো নূর আর রহমান।

সেদিন মিঃ গডসের ফাংশানে নূর ও আরমান উপস্থিত ছিলো। নূর জানতো মিঃ গডসের আনন্দ উৎসবের মূল কারণ। জাহাজ ঈগল চরম সাফল্য লাভ করে ফিরে আসছে এ সংবাদ নূর গোপনে সংগ্রহ করেছিলো। মিঃ গডসে ও তার দলবল গোপনে কান্দাই থেকে এমন সব। মালামাল চোরাচালান করতো যার বিনিময়ে সে পেতে কোটি কোটি টাকা।

নূর কান্দাই পুলিশমহলের সাহায্য গ্রহণ না করে নিজে কখনও কুলি-মজুরের ছদ্মবেশে, কখনও ড্রাইভার বা ঠেলাগাড়ীর চালক হয়ে কাজ করেছে। বন্ধু আরমানের কাছে নূর যথেষ্ট সহযোগিতা ও সাহায্য পেয়েছে।

হঠাৎ একদিন নূর অন্যমনস্কভাবে বাংলোয় নিজের ঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে চমকে উঠলো, কে যেন বসে আছে তার হলঘরের বারেন্দার সিঁড়ির উপরে নূর দাঁড়িয়ে তাকালো ভালো করে। চিনতে পারলো নূর-ও জাভেদ।

নূর ঘরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে হলঘরে এসে বসলো, তারপর বয়কে ডেকে বললো— বাইরে সিঁড়িতে ধাপে কে বসে আছে তাকে ভেতরে ডাকো।

বয় বললো–স্যার, লোকটা অনেকক্ষণ এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছে। ডেকে আনবো?

হাঁ, আনো।

নূর একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে নিজের মুখটা আড়াল করে বসলো, লক্ষ রাখলো পত্রিকায়।

বয় বললো স্যার এসেছে।

নূর পত্রিকা সরিয়ে তাকালো, জাভেদকে লক্ষ্য করে বললো তুমি?

জাভেদ স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলো-হাঁ, আমি তোমাকে দেখতে এলাম। আরও দু'দিন এসেছি, তোমাকে না পেয়ে ফিরে গেছি।

তুমি আমাকে দেখতে এসেছিলে আরও দুদিন।

হাঁ।

নূর কিছুক্ষণ নির্বাক চোখে তাকিয়ে ছিলো সেদিন। সত্যি জাভেদের চোখেমুখে দেখেছিলো নূর রক্তের আকর্ষণ। নূর তার সহোদর জানতে পেরেই জাভেদ এসেছে তার সাক্ষাৎ আশায়, সেই কান্দাই জঙ্গল থেকে কান্দাই শহরে নূরের বাংলোয়।

নূর জাভেদকে আলিঙ্গন করে নিজের পাশে বসিয়েছিলো। তারপর অনেক কথা বলেছিলো, এমন কি একসঙ্গে খেয়েও ছিলো নূর। আর জাভেদকে নিয়ে নূর বিপদে পড়তে যদি তার বাসস্থান না হয়ে অন্য কোথাও হতো। ভদ্র পরিবেশে জাভেদ বড় হয়নি। তাই সে সভ্য সমাজে মেশার মত জ্ঞান লাভ করেনি। কতকটা বন্য স্বভাব ছিলো জাভেদের মধ্যে। বড় একটা জামা কাপড় পাতোনা সে। প্রায় খালি গায়ে থাকতে বেশি আনন্দ পেতে জাভেদ। ঐ দিনও জাভেদ গায়ে কোনো জামা পরেনি।

খাবার সময় দু'হাতে যখন জাভেদ খাবারগুলো গোগ্রাসে খাচ্ছিলো তখন নূরের ভীষণ অবাক লাগছিলো তবুও কোন রকম দ্বিধাবোধ করেনি। তবে বয় ছেলেটা যখন অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলো তখন বড় অস্বস্তি লাগছিলো নূরের

কাছে। জাভেদকে নুর ভালবেসেছিলো মনের আকর্ষণে, তাই ওর প্রতি ছিলো না নূরের কোনো হিংসা-বিদ্বেষ ভাব।

খাবার খেয়ে জাভেদ পরিতৃপ্ত হয়েছিলো। বেশ কিছু সময় কাটানোর পর বিদায় নিয়েছিলো জাভেদ নূরের কাছে।

এরপর প্রায়ই আসতো জাভেদ।

একদিন আরমানের সঙ্গে জাভেদের পরিচয় করিয়ে দেয় নূর। তারপর ধীরে ধীরে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে তিনজনের মধ্যে। নূর এবং আরমান জাভেদের সঙ্গে মিশে বেশ বুঝতে পারে যে, জাভেদ যেমন শক্তিশালী তেমনি সাহসী। ওকে অনেক কাজে লাগানো যেতে পারে।

কান্দাই রহস্য নিয়ে নূর ও আরমান যখন আলাপ-আলোচনা করতো তখন জাভেদ যোগ দিতো তাদের দলে, অবশ্য সে কথাবার্তা তেমন বলতো না কিন্তু সে বুঝতে এবং অনুধাবন করতো।

একদিন ঈগল ধ্বংসের ব্যাপার নিয়ে আর তার বন্ধু আরমান গোপন আলোচনা করছিলো, এমন সময় জাভেদ এসে হাজির হলো। আজকাল জাভেদ প্রায়ই আসে নূরের এখানে। নূর আর আরমানের সান্নিধ্যে সে অনেকটা আধুনিক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি গাড়ি চালানও সে শিখে নিয়েছে। মাঝে মাঝেই নূরের গাড়ি চালাতে জাভেদ। কান্দাই শহর ছেড়ে দূরে অনেক দূরে কান্দাই পর্বতমালার পাদমূলে চলে যেতো। গাড়িতে নূর আর আরমানও থাকতো। দুর্গম পথে গাড়ি চালাতে এতটুকু বিচলিত হতো না জাভেদ। তার এমন দুঃসাহস মাঝে মাঝে নূর ও আরমানকে বিস্মিত করতো। জাভেদকে নিয়ে নূর আর আরমান নতুন এক স্বপ্ন দেখলো। ওকে নিয়ে চিন্তা করলো অনেক কিছু।

নূর তার ডিটেকেটিভ জীবনে পুলিশের সহযোগিতার চেয়ে আরমানের সহায়তায় বেশি উপকৃত হয়েছে। কান্দাই ছাড়াও বিভিন্ন শহর বন্দর নগরে নানা কুচক্রী দল নানা ধরনের কালো বাজারি অসৎ ব্যবসা গোপনে চালিয়ে অর্থের পাহাড় গড়ছিলে নূর তাদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত সাজা দেবার ব্যবস্থা করতো, তখন হয়তো পুলিশমহলের সহযোগিতার দরকার হতো। ইতিমধ্যে নূর কান্দাইয়ে বহু দুষ্কৃতিকারীর সুপরিচালিত প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়েছে। নুর আর আরমান যখন দুষ্কৃতিকারীদের সমূলে ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে চলেছে,

এমন দিনে জাভেদ এসে দাঁড়ালো তাদের পাশে। প্রথমে নূর ওকে ছোট ভাইয়ের স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আদর জানালেও পরে ওকে নিয়ে চিন্তা করলো, পরামর্শ করলো আরমানের সঙ্গে ওকে কাজে লাগানো যায় কিনা। ওর জীবনটা যেন বিফলে না যায় এজন্য ভাবলো ওরা। আর সে কারণে নূর ও আরমান তাকে নানাভাবে নানা কাজে উৎসাহী করে তুলতে লাগলো।

জাভেদও নতুন কাজ পেয়ে নতুন রূপ ধারণ করলো। গভীর জঙ্গল ছেড়ে ছুটে আসতো শহরে। আস্তানা থেকে বেরুতে সে অশ্বপৃষ্ঠে। জঙ্গল অতিক্রম করার পর অশ্বটিকে ছেড়ে দিতো, তারপর চলে আসতে পায়ে হেঁটে।

নূর ও আরমানের সঙ্গে তার সময় কাটাতো নানা শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য দিয়ে। সুদীর্ঘ সময়ে জাভেদ অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করলো বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র চালনা ছাড়াও যানবাহন চালনা শিক্ষা লাভ করলো নূর ও আরমানের সহায়তায়।

মিঃ গডসের অসৎ উদ্দেশ্যকে সমূলে ধ্বংস করতে হলে তার ব্যবসার মূল চাবিকাঠি জাহাজ ঈগলকে বিনষ্ট করতে হবে এবং তা কেমন করে সম্ভব হবে, এই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা, আলাপ-আলোচনা চললো। সেই আলোচনার মধ্যে আজকাল জাভেদও থাকত কারণ সেও বুঝতো সবকিছু।

মাঝেমধ্যে জাভেদ আস্তানা থেকে নানা ধরনের অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করে দিতো নূর ও আরমানের কাজে সহায়তার জন্য।

জাহাজ ঈগল ধ্বংস করার ব্যাপার নিয়ে নূর আর আরমান যখন গভীরভাবে ভাবছিলো তখন জাভেদ সাবমেরিন দিয়ে ঈগলকে ধ্বংস করার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। সে জানালো কান্দাই সাগরের তলদেশে তাদের কয়েকটি উন্নতমানের সাবমেরিন রক্ষিত আছে। এসব সাবমেরিন বনহুরের নিজস্ব কাজেই জাভেদের তা পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। সাবমেরিন চালাতেও জানে সে, কাজেই ঈগল ধ্বংস করা সহজ হবে।

জাভেদের কথায় নতুন এক চিন্তাধারা জাগলো নূর ও আরমানের মনে। হিংস্র মনোভাব জেগে উঠলো, যেমন করে হোক শয়তান গডসের বিষদাত ভাঙতে হবে।

সমস্ত ঘটনা নূর বললো রহমানের কাছে।

নূরের চোখ দুটো তখন ঝাপসা হয়ে এসেছে। গলা বাষ্পরুদ্ধ, তাকালো নূর সামনের সীমাহীন আকাশের দিকে। পিতার স্মৃতি জেগে উঠেছে তার মনে।

*

মিঃ গডসে তার ভূগর্ভ কক্ষে বসে রয়েছে।

তার সামনে টেলিভিশন ক্যামেরা এবং পাশে টেলিভিশন পর্দা। একটির পর একটি সুইচ টিপছে মিঃ গডসে, কান্দাই সাগরতলে তার ঈগলের কি অবস্থা দেখার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ ঈগলের অভ্যন্তরে ছিলো টেলিভিশন ক্যামেরা যার দ্বারা ঈগলের ভেতরে এবং ঐ জাহাজের আশেপাশে কি ঘটছে সবকিছু লক্ষ করতে সক্ষম হতো মিঃ গডসে। ঐ ক্যামেরার এমন একটি শক্তি ছিলো যা দিয়ে সবকিছু স্বচক্ষে দেখতে পেতো এবং জানতে পারতো। এ ক্যামেরা কোনোক্রমে নষ্ট হবার নয়,সেই জন্যই এটা ঈগলে রক্ষিত ছিলো।

মিঃ গডসে সুইচ টিপছে, হঠাৎ টেলিভিশন পর্দায় ফুটে উঠলে গভীর সাগরতলের ছবি। জাহাজ ঈগল পানির তলদেশে তলিয়ে গেছে, কাৎ হয়ে আছে জাহাজখানা। খালাসী এবং জাহাজের চালকের মৃতদেহগুলো আটকা পড়ে গেছে বিভিন্ন ক্যাবিনের খোলের মধ্যে। হঠাৎ নজরে পড়লো সাবমেরিনের ভগ্ন অংশের মধ্যে অদ্ভুত পোষাকপরা এক তরুণ, তার মুখে এবং পিঠে অক্সিজেন পাইপ। তরুণ জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না তবে সাবমেরিনের গহবরে আটকা পড়ে আছে।

মিঃ গডসের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

আপন মনে বললো—সে আমার সর্বনাশ করেছে, আমার স্বপ্ন নস্যাৎ করে দিয়েছে। যদি সে জীবিত থাকে তাহলে আমি ওর সমস্ত দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে বুল উগকে খাওয়াবো—-দক্ষ ডুবুরী আমার হাতের মুঠোয় আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ গডসে ফিরে তাকায়।

চমকে উঠে মিঃ গডসে।

কে যেন তার পেছনে দাঁড়িয়ে তারই মত তীক্ষ্ণ নজরে দেখছিলো সম্মুখস্থ টেলিভিশন পর্দায়। মিঃ গডসে ফিরে তাকাতেই ছায়ামূর্তি বললো–ঈগলকে

হারিয়ে তুমি উন্মাদ হয়ে গেছো। মনে করো না ডুবুরী দিয়ে ঈগলের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া সম্পদ তুমি উদ্ধার করবে।

কে তুমি?

পরিচয় পাবার পূর্বেই তোমার জীবনলীলা সাঙ্গ হবে–শুধু তোমার নয়-তোমাকে যারা সহযোগিতা করতে তাদেরকেও আমি তোমার সঙ্গী করে দেব।

তুমি কে? এত সাহস তোমার আমার এই গোপন পুরীতে প্রবেশ করে ফিরে যাবে। এক পা বাড়াতে পারবে না, যেদিকে এগুবে বিদ্যুৎ সংযোগ করা রয়েছে। তড়িতাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ছায়ামূর্তি।

মিঃ গডসের দুচোখে বিস্ময় কে তুমি?

ছায়ামূর্তি বললো—যাকে তুমি ভয় পাও। সেই মৃত্যুদূত।

তুমি! দস্যু বনহুর? এখানে কি করে প্রবেশ করলে? আর আরমানহুডের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এলেই বা কি করে?

জানোনা?

জানি তোমার অসাধ্য কিছু নেই। তাই বলে তুমি সেই মৃত্যুকূপ থেকেও বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে?

হাঁ। শুধু মিশরীয় ষড়যন্ত্র নয়, তোমার কুচক্রও আমি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছি। গডসে, আজ তোমার উদ্ধার নেই। তোমার সমস্ত সহকারীসহ তুমি তোমার এই গোপন দুর্গম ভূগর্ভস্থ গুপ্ত কক্ষে চিরবন্দী রইলে। একচুল নড়লেই তোমার ছড়ানো বিদ্যুতের স্পর্শে তুমিই মৃত্যুবরণ করবে। কথাটা শেষ করে বনহুর আলগোছে বেরিয়ে গেলো।

মিঃ গডসের দিকে তাকিয়ে অনায়াসে চলে গেলো বনহুর।

গডসের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। তার সঙ্গে একটা ভয়ংকর ভীতিভাব। যে বনহুরের কবল থেকে রক্ষার জন্য মিঃ গডসে কোটি কোটি টাকা খরচ করে

মিশরীয় সরকারের সঙ্গে যোগ দিয়ে বনহুরকে আটক করে তাকে মিশরীয় পিরামিডের অভ্যন্তরে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিলো, সেই বনহুর পুনরায় ফিরে এসেছে কান্দাই শহরে। আর্মানহুড তাকে বন্দী করে রাখতে সক্ষম হয়নি। সে বিনাদ্বিধায় মুক্ত হয়ে আবার তার ওপর হানা দিয়েছে। কিন্তু এত ভাববার সময় নেই। ভূগর্ভ গুপ্ত কক্ষগুলোতে তড়িৎপ্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে। দুলছে সমস্ত কক্ষের মেঝেগুলো, টলছে মিঃ গডসের দেহটা। পা দু'খানা কিছুতেই স্থির রাখতে পারছে না।

ওদিকের কক্ষগুলো থেকে ভেসে এলো মৃত্যুভয়াল আর্তনাদ আ-আ-আ-সেকি ভীষণ এক মুহূর্ত! একসঙ্গে বেশ কিছু ব্যক্তির মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর কণ্ঠস্বর। গডসের রক্তশূন্য মুখমণ্ডল মৃত্যুর ভয়ে ভীত। দেহটা টলছে কোনোক্রমে দেয়ালে হাত দু'খানা স্পর্শ হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটবে তাতে কোনো ভুল নেই।

বনহুর বেরিয়ে গেছে।

নিজের সহকারিগণ সহ গডসে পাতাল পুরীর গোপন মৃত্যুকূপে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লো। পৃথিবীর মানুষ কেউ জানতে পারলোনা কোথায় হারিয়ে গেছে মিঃ গডসে ও তার সহকারিগণ।

নিস্তব্ধ পুরীর অন্ধকারে তলিয়ে গেলো মিঃ গডসের সবকিছু।

নির্বোধ মিঃ গডসে ভেবেছিলো সে বনহুরকে পরাহত করে, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে অসৎ ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজেকে কান্দাই এর বুকে প্রতিষ্ঠিত করবে কিন্তু সাধ তার পূর্ণ হলো না। বনহুর মৃত্যু গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে সমূলে ধ্বংস করলো।

বনহুর বিদায় মুহর্তে গডসের ক্ষুদে টেলিভিশন ক্যামেরাটা তুলে নিয়েছিলো, কারণ এ ক্যামেরার মাধ্যমেই বনহুর ডুবে যাওয়া ঈগলের অভ্যন্তরের সবকিছু দেখতে পাবে।

বনহুর ফিরে এলো আস্তানায়।

রহমানকে ডেকে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করলো।

সর্দারকে ফিরে আসতে দেখে সবার মনেই আনন্দ ধরে না, সকলেই মনে মনে আল্লাহতায়ালার দরবারে শুকরিয়া করলো। কারণ সবাই জানতো তাদের সর্দার মিশর পিরামিড আর্মানহুডের অভ্যন্তরে বন্দী। আর কোনোদিন ফিরে আসবে কিনা সন্দেহ ছিলো। যদিও তারা জানতো বনহুরকে বন্দী করে রাখার সাধ্য কারও নেই তবুও তাদের মনে ছিলো উকুণ্ঠা, দ্বিধা আর ভয়। কারণ কান্দাই সরকার এবং মিশরীয় সরকারের প্রচেষ্টাতেই। বনহুরকে বন্দী করা সহজ হয়েছে। এতবড় শক্তিশালী চেষ্টা নস্যাৎ হবার নয়, তাও সকলে জানতো। সর্দার ফিরে আসায় আনন্দ উৎসব বয়ে চললো আস্তানায়। তবে ঐ আনন্দের মাঝে ছিলো একটা গোপন নিরানন্দের ছায়া। আর কেউ না জানলেও জানতো রহমান, এই নিরানন্দের কারণটা। তাদেরই প্রিয় জাভেদ সবার অলক্ষ্যে কান্দাইয়ের দুষ্কৃতিকারী মহলকে সায়েস্তা করার জন্য জাহাজ ঈগলকে ধ্বংস করতে সাবমেরিন নিয়ে কান্দাই সাগরতলে নেমে গিয়েছিলো। আর সে ফিরে আসেনি। রহমান পূর্বে জানতো না, সে জেনেছিলো নূরের কাছে। কথাটা শুনে মাথায় তার বজ্রাঘাত হয়েছিলো, কিন্তু উপায় ছিলো না কিছু।

বনহুর আর রহমানের যখন কথা হচ্ছিলো তখন বনহুর সবকিছু জানালো রহমানকে এবং বনহুরের টেলিভিশন মেশিনরুমে মিঃ গডসের রহস্যময় গুপ্ত কক্ষ থেকে আনা ক্ষুদে টেলিভিশন ক্যামেরাটা বসিয়ে নিলো, তারপর সুইচ টিপতেই দেখা গেল কান্দাই সাগরতলে ডুবন্ত ঈগলের শেষ অবস্থা। কি ভয়ংকর অবস্থায় জাহাজ ঈগল তলিয়ে গেছে। ঈগলের তলদেশ সম্পূর্ণ ফেঁসে গেছে, সেই পথে নজরে পড়ছে সাবমেরিনটার কিছু অংশ, ওটার মধ্যে আটকে আছে অক্সিজেন পাইপ পরা একটি মনুষ্যদেহ।

ওটা দেখামাত্র রহমান প্রায় চিৎকার করে বলতে যাচ্ছিলো, সর্দার ঐ তো জাভেদ কিন্তু বনহুর তার মুখে হাত দিয়ে বললো— কথা বলোনা রহমান। সব বুঝতে পেরেছো এবার তৈরি হয়ে নাও, এক্ষুণি রওয়ানা দেবো।

সর্দার!

হাঁ রহমান, বিলম্ব করা মোটেই উচিত হবে না। যদি ডুবন্ত ঈগলের গহ্বর থেকে সাবমেরিনটা সরিয়ে নিতে পারি তাহলেই জাভেদকে বের করে আনতে পারবো।

সর্দার পারবেন?

হয়তো পারবো কিন্তু জাভেদ জীবিত আছে কিনা সন্দেহ।

রহমান তার একখানা হাতই তুলে ধরলো উপরের দিকে, হে পাক পরওয়ারদেগার, তুমি মেহেরবান। আমার জাভেদকে জীবিত রেখো। তারপর বললোসর্দার, কি করতে হবে?

আমাদের জাহাজ প্রস্তুত করে নাও। তবে জাহাজে তোমরা চলে আসবে, আমি আর একটি ক্ষুদে সাবমেরিন নিয়ে রওয়ানা দেবো। কারণ আমাকে অত্যন্ত দ্রুত কান্দাই সাগরের মোহনায় পৌঁছতে হবে। অক্সিজেন পাইপ এবং ডুবুরী ড্রেস জাহাজে তুলে নাও।

সব প্রস্তুত আছে সর্দার। কিন্তু আপনি এসেছেন এ কথা অনুচরগণ সবাই জেনেছে। নূরী নাসরিন, ফুল্লরা এরা যখন জানতে পারবে আস্তানায় এসে আপনি তাদের কারও সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেছেন তাহলে তারা নিশ্চয়ই দুঃখ পাবে —-

রহমান, সে সময় পাচ্ছি না, কারণ জাভেদ যদি জীবিত থাকে তাহলে সেই দিকটাই আমার আগে দেখা দরকার।

হাঁ সর্দার, আপনি যা বলেছেন সত্য। চলুন আর মোটেই বিলম্ব করা উচিত হবে না।

যাও তাজকে প্রস্তুত করো।

রহমান বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে তাজের পাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর। তাজ বহুদিন পর প্রভুকে পাশে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলো। সম্মুখ পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে শব্দ করলো, চিহি—- চিহি–

বনহুর তাজের পিঠ চাপড়ে আদর করলো। বনহুর আর রহমান নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করলো। এবার ছুটে চললো অশ্ব দুটি। কান্দাই জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হলো অশ্বখুরের শব্দ।

নুরী আস্তানায় ঝরনার পাশে বসে ছিলো। হঠাৎ তার কানে ভেসে আসে অশ্বখুরের আওয়াজ, দ্রুত বেরিয়ে আসে সে। একজন অনুচরকে লক্ষ্য করে বললো—আমি তাজের খুরের আওয়াজ পেলাম। কে এসেছিলো বলো?

অনুচরটি জানে সর্দার সবার অলক্ষ্যে এসেছিলো, কারণ ছিলো কাউকে না জানানো। আবার সবার অলক্ষ্যেই চলে গেছে, তাই চট করে কিছু জবাব দিতে পারলো না।

নূরী পুনরায় বললো—কে তাজকে নিয়ে গেছে বলো? রহমান ভাই কোথায়? চুপ করে থেকো না, বলো?

এবার বলতে বাধ্য হলো অনুচরটি, কারণ নূরীর কাছে বেশীক্ষণ নিশ্চুপ থাকার সাধ্য ছিলো না কারও। অনুচরটিও পারলো না, সে বলেই বসলো–সর্দার এসেছিলেন। চলে গেছেন—-

নূরী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বললো——-সর্দার এসেছিলো?

হাঁ রাণীজী, সর্দার এসেছিলেন।

তবে সে আস্তানার ভেতরে যায়নি কেন?

জানি না। দরবারকক্ষে বসে রহমান ভাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন, তারপর ওয়্যারলেসে কারও সঙ্গে কথা বলেছে—-

তারপর?

মেশিনকক্ষে বসে কাজ করেছেন তারপর রহমান ভাই এবং সর্দার ঘোড়া নিয়ে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন জানি না রাণীজী।

নূরী গভীর চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। হুরকে কান্দাই পুলিশ মহল এবং মিশরীয় পুলিশ বাহিনী যুক্ত প্রচেষ্টায় আর্মানহুড পিরামিডের অভ্যন্তরে আটক করেছিলো, এ কথা শুধু আস্তানাতেই নয়, সমস্ত দেশবাসী জানে। নূরী চোখের পানি ফেলেছে, ব্যথায় ভেঙে পড়েছে, রহমান তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, দেখিস নূরী, তুই কিছু ভাবিস না, সর্দার ঠিক ফিরে আসবে। তাকে আটকে রাখতে পারে এমন শক্তি কারও নেই। নূরীও জানতো হুরকে বন্দী করে রাখার মত কোনো শক্তি আজও

সৃষ্টি হয়নি। তাই নূরী সর্বক্ষণ প্রতীক্ষা করতে এক সময় সে ফিরে আসবেই। অনুচরটির মুখে যখন শুনলো সর্দার এসেছিলেন—-কথাটা শুনে আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো নূরীর মন। অনাবিল শান্তিতে ভরে উঠেছিলো তার সমস্ত অন্তর। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, হুর এলো, আবার কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায়ই বা চলে গেলো। রহমান সঙ্গে গেছে তাই কতকটা সান্ত্বনা, যেখানেই যাক ফিরে আসবে আবার।

নুরী অনুচরটির কাছে আর বেশি কিছু জানতে পারলো না। আরও একটা চিন্তা নূরীর মনকে বিদগ্ধ করছিলো তা হলো জাভেদ হঠাৎ কোথায় চলে গেছে জানে না তারা। আজ ক'দিন ধরে জাভেদ আস্তানায় ফিরে আসেনি তাই আস্তানার সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত। ফুল্লরা নাওয়া খাওয়া এক রকম ছেড়ে দিয়েছে, জাভেদ ফুল্লরার স্বপ্ন তার সাধনা। সব বোঝে নূরী, সব জানে সে। ফুল্লরার চোখের পানি নূরীর হৃদয়কে খান খান করে দেয়। কিন্তু জানে না কোথায় জাভেদ।

নিশ্চুপ থাকার মেয়ে নয় রী। সে মেশিনকক্ষে ফিরে গেলো এবং ভালভবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। অনুচরটি বলেছিলো সর্দার মেশিনকক্ষে বসেছিলো এবং সেখানে রহমান ভাইয়ের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়, তারপর তারা নিজ নিজ অশ্ব নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

নূরীর মন বললো, হয়তো কান্দাই সাগরে জাহাজে গেছে। সেখানে তার কোনো কাজ থাকতে পারে। কিন্তু কেন গেলো–তবে কি জাভেদের কোনো বিপদ ঘটেছে—-নূরীর মনে নানা চিন্তার উদ্ভব হলো! মেশিনকক্ষ থেকে বেরিয়ে নূরী তার ড্রেস পাল্টে নিলো, তারপর অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

অনুচরটি অবাক হয়ে গেলো। হঠাৎ রাণীজী কোথায় চললো কে জানে!

নূরী শিকারীর ড্রেসে সজ্জিত হয়েছিলো, তার পায়ে বুট, কোমরের বেল্টে রিভলভার, জঙ্গল ভেদ করে নূরীর অশ্ব ছুটে চললো।

*

কান্দাই সাগর।

বনহুরের জাহাজ উল্কা।

বনহুর আর রহমান ড্রেসিং ক্যাবিনে। সাবমেরিন গভীর সাগর তলে প্রতীক্ষা করছে। বনহুর ডুবুরীর পোশাক পরে মুখে অক্সিজেন পাইপ লাগিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে জাহাজের খোলের তলদেশে নামার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় নূরীর অশ্ব উল্কার পাশে সাগরতীরে এসে দাঁড়ালো।

দ্রুত অশ্ব থেকে নেমে নূরী জাহাজে উঠে এলো।

বনহুর যে ক্যাবিনে ঐ ক্যাবিনের দিকে লক্ষ করে বললো একজন অনুচর সর্দার ঐ ক্যাবিনে।

নুরীর মুখোভাব লক্ষ করে অনুচরটি না বলে পারলো না। রাণীজীকে তারা ভালভাবেই চেনে। যখন সে ভার তখন তারমুখে হাসির বন্যা ঝরে পড়ে আর যখন নূরী ক্রুদ্ধ হয় তখন তার সম্মুখে দাঁড়ানোর সাহস কেউ পায়না। রাগে ঝ ঝন্ করে সে। নূরী কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

অবাক হলো বনহুর। সবে সে অক্সিজেন পাইপ মুখে আটতে যাচ্ছিলো এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ালো চোখেমুখে তার অভিমান ঝরে পড়ছে। বনহুর হাস্যোজ্জ্বল দ্বীপ্ত কণ্ঠে বললো নূরী তুমি!

হাঁ, আমি এলাম। বনহুর এখনও কি তুমি পূর্বের সেই ছেলেমানুষ। এখনও তোমার খামখেয়ালী। তুমি আস্তানায় গিয়ে আসার সঙ্গে দেখা না করেই বেরিয়ে এসেছে! আবার নতুন সাজে সাগরতলে নামার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নূরী সব পরে তোমাকে বলবো। কেন আস্তানায় গিয়েও তোমাদের সঙ্গে দেখা না করে চলে এসেছি। সব শুনবে, পরে বলবো, অনেক কথা আছে।

নূরী অভিমানরা গলায় বললো—-আমার সঙ্গে কথা বলার সময় তোমার হয় না। জানি সব সময় তুমি আমাকে এড়িয়ে চলল। বলল এতদিন কোথায় ছিলে?

গভীর কণ্ঠে বললো বনহুর—আমানহুড়ের গহ্বরে।

তা আমি জানি।

তাহলে এখন আর প্রশ্ন করোনা নূরী। আমি চলেছি কান্দাই সাগরতলে তোমার সন্তান জাভেদকে উদ্ধার করতে, যদি সে বেঁচে থাকে তবে আমার এ প্রচেষ্টা

সার্থক হবে আর যদি

নূরী দেখল হাতখানা দিয়ে বনহুরের মুখে চেপে ধরলো, কথা শেষ করতে দিলো না। বিস্ময় আর কান্নাভরা কণ্ঠে বললো—জাভেদ তাহলে কান্দাই সাগরতলে?

হাঁ নূরী, সব তোমাকে বলবো ফিরে এসো তাছাড়া রহমানের কাছে জেনে নিতে পারো আমাকে বিদায় দাও নূরী।

নূরীর চোখ দুটো ছল ছল করছিলো, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো–যাও হুর! যাও তুমি—-

বনহুর অক্সিজেনভরা পাইপসহ মুখোশ মুখে পরে নিলো। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে সাগরের গভীর অতলে তার সাবমেরিনের দিকে।

[পরবর্তী বই ঈগলের গরে বনহুর]

পূর্ববর্তী:

« ৮.১২ পিরামিডের অভ্যন্তরে (১)

পরবর্তী:

৮.১৪ ঈগলের গহ্বরে বনহুর »